কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি

গ্রন্থনা ঃ

শ্রী বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা

সম্পাদনা সহযোগী ঃ

শ্রী রতি কান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

শ্রী উচ্চতমনি তঞ্চঙ্গ্যা

শ্রী লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

শ্রী অনিল তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা মহা সম্মেলন

১৯৯৫ ইং // ১৪০১ বাংলা

বাংলাদেশ ।

তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি

TANCHANGYA PARICHITI

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৩শে চৈত্র, ১৪০১ বাংলা;
৬ই এপ্রিল, ১৯৯৫ ইং;
২৫৩৮ বুদ্ধবর্ষ।

আর্থিক সহায়তা ঃ **শ্রী প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা**
সদস্য, স্থানীয় সরকার পরিষদ, বান্দরবান
ও
আহ্বায়ক, তঞ্চঙ্গ্যা মহাসম্মেলন ১৯৯৫ ইং।

প্রকাশনায় ঃ **তঞ্চঙ্গ্যা মহাসম্মেলন উদ্‌যাপন কমিটি ১৯৯৫** ইং।

প্রচ্ছদ অলংকরণে ঃ **শ্রী রতি কান্ত তঞ্চঙ্গ্যা**

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ **বিন্যাস,** ৪২ শৈল বিতান, রাঙ্গামাটি।

মুদ্রণে ঃ নিও **কনসেপ্ট লিঃ**, চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ সত্তর টাকা।

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ

তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যপূর্ণ বসতগৃহ। মূলঘর এবং তৎসংলগ্ন রান্নাঘর। মূলঘরের সিংকাবায় আরাম আয়েশের জন্য ঈষৎ হেলান "মংগা" থাকে। মূলঘরের সামনে ইচর-এবং ইচরের শেষপ্রান্তে টংঘর। অতিথি অভ্যাগতদিগকে এখানে তোলা হয়। কর্মান্তে গৃহমুখী নরনারী। ছবির নিম্নে তঞ্চঙ্গ্যা মহিলা মাথায় তিনটি পানির পাতিল, পিছনে কাল্লোং ও পানির পাতিল। কাঁধে পানির কলসী। ইহা তঞ্চঙ্গ্যাদের পবিত্রতা, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ের প্রতীক।

উৎসর্গ

ইতিহাসের কোন শুভলগ্নে যারা দৈংনাক নামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সেই দৈংনাক নামধারী জনগণ এবং কালক্রমে তঞ্চঙ্গ্যা নামে যারা বিকশিত হয়ে এসেছেন ও ভাবীকালে অমৃতসম্ভবা সেই তঞ্চঙ্গ্যা জনগণের হাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি উৎসর্গ করা হল।

সূচীপত্র

	বিষয়	-	পৃষ্ঠা
১.	প্রাক্‌-কথন ঃ	–	১
২.	দৈংনাক-তৈনটংগ্যা-তঞ্চঙ্গ্যা	–	৫
৩.	সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	–	৭
৪.	দৈংনাকের নব জন্ম ঃ ভাগ্যের সন্তান তঞ্চঙ্গ্যাগণ	–	২৩
৫.	গোঝা ও গুষ্ঠি ঃ	–	২৯
৬.	ভাষাঃ	–	৩০
৭.	পোষাক পরিচ্ছদ ও অলংকার ঃ	–	৩৪
৮.	তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কে কোন বিষয়ে সর্বপ্রথম ঃ	–	৩৫
৯.	বর্তমানে স্নাতকোত্তর ও টেকনিক্যাল শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্রছাত্রীদের তালিকা ঃ	–	৩৯
১০.	তঞ্চঙ্গ্যাদের উচ্চ শিক্ষার খতিয়ান/তালিকা ঃ	–	৪০
১১.	সামাজিক অনুষ্ঠান ঃ	–	৪৩
	বিবাহ্ পদ্ধতি, সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা, শবদাহ ও অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া, অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বাদ্যযন্ত্র ও সংগীত।		
১২.	পরিশিষ্ট	–	৫৭
১৩.	সহায়ক গ্রন্থ সমূহ ঃ	–	৬০

বাংলাদেশে যে সকল আদিবাসী উপজাতি জনগোষ্ঠী আছে তঞ্চঙ্গ্যা হচ্ছে তাদের অন্যতম। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায়, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া থানাধীন রইস্যাবিলি এলাকায়, কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেক্নাফে তঞ্চঙ্গ্যাদের বসবাস। এখানে তাদের সংখ্যা অর্ধলক্ষাধিক। এতদ্ব্যতীত ভারতের ত্রিপুরা, অরুণাচল, মিজোরাম ও মনিপুরের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে তঞ্চঙ্গ্যাদের বসবাস রয়েছে। আরাকান তথা মায়ানমারেই তঞ্চঙ্গ্যাদের সংখ্যা সমধিক। তঞ্চঙ্গ্যাদের সর্বমোট জনসংখ্যা চারি লক্ষাধিক বলে জানা যায়। উল্লেখ্য যে, আরাকান বা মায়ানমারে দৈংনাক নামেই তারা পরিচিত।

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পৃথিবীতে যে কতিপয় বৃহৎ নর বা জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায় তন্মধ্যে মংগোলীয়দের সংখ্যাই সর্বাধিক। সমগ্র মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহ এই মংগোলীয় জন অধ্যুষিত। মংগোলীয়া, চীন (তিব্বতসহ), কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে মংগোলীয়দের বাস। মধ্য এশিয়া এবং চীন দেশের জনগোষ্ঠী এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে দৈহিক গঠন এবং চেহারাগত সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় এই মংগোলীয় জনগোষ্ঠীর ন্যায় তঞ্চঙ্গ্যাগণ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার (মংগোলীয়) জনগোষ্ঠীর দলভুক্ত। তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ভারতীয় আর্য্য ভাষা অন্তর্গত পালি, প্রাকৃত সম্ভূত বাংলা ভাষা।

কৃষ্টি ঐতিহ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির পার্থক্যহেতু একই জনগোষ্ঠীর লোককে পৃথক পৃথক সত্তার অধিকারী বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ইহার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট বারটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী বা জাতিসত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায়। (১) চাকমা, (২) মারমা, (৩) ত্রিপুরা, (৪) তঞ্চঙ্গ্যা, (৫) ম্রো বা মুরুং (৬) বম, (৭) উচই, (৮) পাংখোয়া, (৯) খিয়াং, (১০) খুমী, (১১)

লুসাই ও (১২) চাক (জনসংখ্যা অনুসারে সাজানো) সরকারীভাবে এই বারটি জনগোষ্ঠীকে পৃথকভাবে জনগননা বা census এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পর্কে বিস্তর বিতর্কিত আলোচনার সুত্রপাত হয়েছে। বিশেষতঃ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থাৎ রাঙ্গামাটি বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এই তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার চালু হবার পর এই আলোচনা সর্বাধিক হচ্ছে। কেননা, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদে তঞ্চঙ্গ্যাদের জন্য পৃথক সদস্য পদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে বলে।

দীর্ঘকাল ধরে তঞ্চঙ্গ্যাদিগকে চাকমা জাতির একটি শাখা হিসেবে ধরা হয়ে আসছে। চাকমাগণ তঞ্চঙ্গ্যাদিগকে মূল চাকমা বলেও স্বীকার করে। চাকমা জাতির ইতিহাস রচয়িতা বা ঐতিহাসিকগণ দৈংনাক, তৈনুটংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যাকে চাকমা জাতিরই অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসে বর্ণিত দৈংনাক্, তৈনটংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যা এই তিন নামে যে উপজাতি বা উপজাতিগণকে নিদের্শ করা হয়েছে সেই উপজাতি বা উপজাতিসমূহ আদৌ চাকমা জাতির অংশ কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইহা নিশ্চিত যে, বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যা নামধেয় একটি স্বতন্ত্র উপজাতি বা জনগোষ্ঠীকেই উপরোক্ত তিন নামে নির্দেশ করা হয়েছে। যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম বা বাংলাদেশে এবং ভারতে তৈনুটংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যা নামে পরিচিত তারাই আরাকান তথা মায়ানমারে দৈংনাক নামে পরিচিত। আলোচনার সুবিধার্তে দৈংনাক, তৈনটংগ্যা ও তঞ্চঙ্গ্যা এই তিনটি নামের সমন্বিত রূপ "তঞ্চঙ্গ্যা" শব্দটিই এই পুস্তকে ব্যবহার করা হল।

মূল চাকমা বলে স্বীকার করলেও চাকমাদের ৪৬টি বংশাবলী বা গোঝার মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যাদের ১২টি গোঝা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। চাকমাদের ৪৬টি গোঝার সাথে তঞ্চঙ্গ্যাদের ১২টি গোঝার নামেরও কোন মিল নেই। তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্য, পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, আবাস গৃহের বিশিষ্টতা (যদিও বর্তমানে আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐ বৈশিষ্ট্য অনুসরনের সুযোগ নেই) সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠান চাকমাদের ঐ সকল বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রূপ ধারণ করেছে কাজেই তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমাকে দুই পৃথক জনগোষ্ঠী বা জাতিসত্ত্বা বলে খুব সহজেই চেনা যায়। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে তঞ্চঙ্গ্যাগণ স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা অক্ষুন্নভাবে টিকিয়ে রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর অগ্রসর উপজাতির ন্যায় শিক্ষা দীক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যা

জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তঞ্চঙ্গ্যাদের অগ্রণী ভূমিকাও লক্ষ্য করা যায়। তাদের এই স্বাতন্ত্র্যের কারনেই পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ সমূহে অন্যান্য উপজাতির ন্যায় তঞ্চঙ্গ্যাদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের জন্য সদাশয় সরকার কর্তৃক সদস্যপদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

ইদানীং কোন কোন পক্ষথেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যা দিগকে বাদদিয়ে শুধু চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো বা মুরুং, বম, উচই, পাংখোয়া খিয়াং, খুমী, লুসাই, চাক এই সকল উপজাতির কথাই বলা হচ্ছে। এমনকি তঞ্চঙ্গ্যাদের পরিচিতি মূলক কোন তথ্য উল্লেখ না করে শুধু উপরোক্ত উপজাতি সমূহের বিবরণী সম্বলিত দলিল তৈরী করার অপচেষ্টাও লক্ষ্য করা গেছে।

অথচ, দৈনন্দিন সরকারী কাজে তঞ্চঙ্গ্যাদের কথা বা বিষয় উল্লেখ থাকছে বা তাদের বিষয় সম্পৃক্ত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যানুপাতে চতুর্থস্থানের অধিকারী তঞ্চঙ্গ্যাগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত কোন কাজে বা তথ্যমূলক কোন বিবরণীতে স্থান না দেওয়ার কোন যুক্তি সংগত কারণ থাকতে পারে না। যদি তাই করা হয়ে থাকে, তাহলে তা বিজ্ঞজনোচিত হবেনা।

পার্বত্য সমগোত্রীয় উপজাতি জনগোষ্ঠীর সাথে এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় অউপজাতীয় বা বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর সাথে তঞ্চঙ্গ্যাগণ দীর্ঘকাল সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশে এবং আরাকান তথা মায়ানমারে ও সুদীর্ঘকাল বসবাসে তারা কোন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে বলে জানা যায়নি এবং তারাও অন্য কোন জনগোষ্ঠীর অপ্রীতি বা অশান্তির কারণ হয়েছে বলে কোন নজিরও নেই।

এসকল জায়গায় বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের এযাবত তেমন কোন যোগসুত্র স্থাপিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে কোন ভাব বিনিময় এবং সম্মেলনী সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের মাঝে মধ্যে সম্মেলন হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। এতে পারস্পরিক ভাববিনিময় হবে। অতীত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা, পারস্পরিক একাত্মতা বোধ জন্মাবে। এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ সহজসাধ্য হবে। সর্বোপরি বিশ্বের অপরাপর মানবগোষ্ঠীর ন্যায় স্বকীয় সত্ত্বা নিয়ে নিজ নিজ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বা জনগনের

সাথে একাত্ম হয়ে দেশ মাতৃকার সেবায় নিজেদের অমূল্য অবদান রাখার উৎসাহ ব্যঞ্জক প্রেরণা পাবে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত যাই হোক না কেন, এবং চাকমা জাতির ইতিহাস গ্রন্থে তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তির কাহিনী যেভাবেই লিপিবদ্ধ হোক না কেন, উৎপত্তির আদিকাল থেকেই তঞ্চঙ্গ্যাগণ স্বতন্দ্র সত্ত্বা নিয়ে একটি পৃথক জাতি বা জনগোষ্ঠী রূপে বিকশিত হয়ে এসেছে। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় তারা সম্পূর্ণ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে সামনে এগিয়ে এসেছে। প্রামান্য দলিল হিসেবে তঞ্চঙ্গ্যাদের সেই ইতিবৃত্তই এই পরিচিতি গ্রন্থের মাধ্যমে সুধীবৃন্দের নিকট তুলে ধরা হয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তি, তাদের বিকাশ এবং কৃতিত্বপূর্ণ কাজের (Achievement) তথ্যসমূহ প্রামান্য গ্রন্থাদি থেকে সংকলিত হয়েছে। কাজেই এই পরিচিতি গ্রন্থ তঞ্চঙ্গ্যাদের স্বতন্ত্র স্বত্ত্বা বিকাশের একটি প্রামান্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি।

প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিকগণ চাকমা জাতির ইতিহাসের ধারা বেয়ে তঞ্চঙ্গ্যাজাতির ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করেছেন; কিন্তু চাকমা জাতির প্রাচীন ইতিহাসের ভিত্তি অনুমান নির্ভর বলে অধুনা চাকমা জাতির ইতিহাস গবেষকদের মনে সংশয় উৎপন্ন হয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যাদের অতীত ইতিহাসের উৎস সন্ধান পাওয়াও গবেষণা সাপেক্ষ। দৈংনাক্ বা তঞ্চঙ্গ্যা নামের উৎপত্তির পর থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক ইতিহাসের গতিধারায় সম্পূর্ণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেভাবে এই জাতিসত্ত্বা বিকশিত হয়ে এসেছে এই গ্রন্থে তারই বিবরণ প্রদান করা হয়েছে মাত্র। ইহা ইতিহাস হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবেনা কেবলমাত্র পরিচিতি হিসেবে বিচার করতে হবে। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে এই গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে বলে অনেক বিষয় অবক্ষ্য থেকে গেছে। ভবিষ্যতে তঞ্চঙ্গ্যাদের ইতিহাস ও বিস্তারিত পরিচিতিমূলক গ্রন্থ প্রকাশের আকাঙ্খা থাকল। স্বল্প সময়ে সম্পাদনার কারণে গ্রন্থে ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নহে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সুধী পাঠক বৃন্দের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

দৈংনাক্-তৈন্টংগ্যা-তঞ্চঙ্গ্যা

দৈংনাক্-তৈন্টংগ্যা-এবং তঞ্চঙ্গ্যা এই তিনটি নাম একই জনগোষ্ঠীর নির্দেশক। বাংলাদেশে, ভারতের অরুনাচল, মিজোরাম ও ত্রিপুরাতে তারা তৈন্টংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যা নামে চিহ্নিত এবং পরিচিত। আরাকান তথা মায়ানমারে তাদেরকে দৈংনাক বলা হয়। অর্থাৎ সেখানে তারা দৈংনাক নামেই চিহ্নিত বা পরিচিত। দৈংনাক আরাকানী শব্দ; অর্থাৎ যোদ্ধা। "তঞ্চঙ্গ্যা" নাম আরাকান তথা মায়ানমারে তেমন প্রচলিত নয়। সেখানে দৈংনাক নামেই তঞ্চঙ্গ্যাদের অভিহিত করা হয়।

উচ্চব্রহ্মেই সর্বপ্রথম দৈংনাকদের নাম পাওয়া যায়। অদ্যাবধি উত্তর মায়ানমার ও আরাকানে দৈংনাক নামেই তঞ্চঙ্গ্যাগন আছেন। ইতিহাসের সুত্র অনুসারে একাংশ আরাকানের উত্তর পশ্চিম দিকে সরে আসে এবং মাতামুহুরীর অপর উপনদী তৈনছড়িতে বসতি স্থাপন করে। দীর্ঘকাল ধরে চাকমাদের পাশাপাশি বসবাস এবং সুখ দুঃখ, ব্যাথা বেদনা, বিপদ আপদের অংশীদারী বলে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাগন পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতায় তথাকথিত একই জাতি বলে বিশ্বাসী। পরবর্তীতে তাই দৈংনাকগন তৈনছড়ি থেকে রাঙ্গামাটির দিকে সরে আসে। চাকমা রাজ সরকারের জুম তৌজিতে তাদেরকে চাকমা বলে উল্লেখ করা হয়নি। তৈনছড়ি এলাকা থেকে আগত বলে তাদেরকে তৈনটংগ্যা নামে তৌজিভুক্ত করা হয়। এই তৈন্টংগ্যা শব্দের পরবর্তী রূপ হচ্ছে তঞ্চঙ্গ্যা।

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষনে তঞ্চঙ্গ্যাগন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মংগোলীয় জন গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত তা পূর্বেই বলা হয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষা সম্ভুত বাংলার আদিরূপের সমতুল্য। বহুপালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দে তাদের ভাষা পরিপূর্ণ।

তঞ্চঙ্গ্যাদের স্বভাব চরিত্র নম্র, রুক্ষতা বর্জিত বিনয়ী। তারা সাধারনতঃ লাজুক স্বভাবের এবং মেজাজে উগ্রতা বর্জিত সরল সাদাসিধা এবং বন্ধুভাবাপন্ন ও উপকারীর প্রতি তারা সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্ত।

তঞ্চঙ্গ্যাগণ মূলতঃ কৃষিজীবি। কৃষিকার্যে তারা অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। কৃষি জমির স্বল্পতার কারণে বর্তমানে উচ্চভূমি বা পাহাড়ে বিভিন্ন ফলের বাগান ও মূল্যবান বৃক্ষের বাগান করে অর্থোপার্জনের উপায় করছে। কঠোর পরিশ্রমী ও কর্তব্যনিষ্ঠ বলে এই কাজে তারা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করছে। উর্বর পাহাড় জমির অভাবের কারণে জুমচাষ পদ্ধতি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। ইদানিং সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহণ করছে। তজ্জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন বিধায় মরিয়া হয়ে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণে তারা বদ্ধপরিকর। অনেকেই প্রযুক্তিগত জীবিকা অবলম্বনের জন্য যোগ্যতা অর্জন নিমিত্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ব্যবসায়ে তারা এখনো পশ্চাদপদ তার কারণ যোগ্যতার অভাব নহে বরঞ্চ Scope এর অভাব হয়ত।

অদ্যাবধি পৃথক তঞ্চঙ্গ্যার ইতিহাস রচনা করা হয়নি। তঞ্চঙ্গ্যাদের [redacted] বিকাশ এবং বর্তমান সম্পর্কে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কেবলমাত্র চাকমা জাতির ইতিহাস গ্রন্থে তঞ্চঙ্গ্যাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। তাও অনুমান নির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে চাকমা জাতির একটি শাখা হিসেবে তঞ্চঙ্গ্যাদের পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে মাত্র।

চাকমারাও তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে চাকমার একটি শাখা বলে স্বীকার করে। এমনকি আসল বা মূল চাকমা ও বলে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চাকমাদের যে গোঝা গুষ্টি আছে সেই সব গোঝা গুষ্টির সাথে তঞ্চঙ্গ্যাদের বারটি গোঝা বা সকল গুষ্টির নামের সাথে কোন মিল নেই। চাকমা জাতির ইতিহাস রচয়িতাগণ তাঁদের রচিত ইতিহাসে এমনকি আধুনিক চাকমা লেখকগণ তাঁদের চাকমাজাতি বিষয়ক রচনায় তঞ্চঙ্গ্যাদের গোঝা গুষ্টি বা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদির নাম চাকমাদের গোঝা গুষ্টি বা আচার অনুষ্ঠান বলে উল্লেখ করেননা। যদি চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা একই জাতিভুক্ত বলে স্বীকার করা হয় -তবে তঞ্চঙ্গ্যাদের গোঝা গুষ্টি বা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদিও চাকমাদের নিজস্ব বলে স্বীকার করার দুর্বলতা থাকবে কেন? হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম বলে দাবী করেন, তাই তথাগত বুদ্ধকে হিন্দুদের অবতার (দশম অবতার) রূপে পূজা করেন।

চাকমা জাতির উত্থান পতন, জয় পরাজয়, আশা আকাঙ্খা, সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনা, অভিযান অগ্রগতি বা সমৃদ্ধির বিবরণীর সাথে তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পৃক্ত করা হয়নি। কেবলমাত্র ইতিহাসের শো'কেসে তঞ্চঙ্গ্যাগণকে পুতুল বানিয়ে আবদ্ধ করেই রাখা হয়েছে।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে চাকমা ইতিহাস গ্রন্থে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তঞ্চঙ্গ্যাগণকে চাকমা জাতির একটি শাখা বলে ধরে নিতে কষ্ট হয়। শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত "চাকমা জাতি", শ্রী মাধব চন্দ্র চাকমা কর্মী রচিত শ্রী শ্রী রাজ নামা, শ্রী বিরাজ মোহন দেওয়ান কর্তৃক লিখিত "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" এবং চাকমা জাতি সম্পর্কীয় অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে একই ধারা অনুসরণ করা

হয়েছে। মূলতঃ একই সূত্রকেই যৎকিঞ্চিৎ রদবদল করে তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত সাজানো হয়েছে।

সতীশ ঘোষ রচিত 'চাকমা জাতি' গ্রন্থে দৈংনাক বা তঞ্চঙ্গ্যার উৎপত্তির কাহিনী নিম্নরূপঃ "৬৯৫ মঘাব্দে (১৩৩৩-৩৪ খৃঃ অঃ) আরাকানাধিপতি মেংগদি সমীপে লামূন ছুগ্রীনামা জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ দিলেন, উচ্চ ব্রহ্মের চাকমা রাজা নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদে তিনি প্রধানমন্ত্রী (কারেংগ্রী) রাজাংগ্যা ছাংগ্রাইর অধীনে দশসহস্র সৈন্য দিয়া চাকমা রাজার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। পরে রিজার্ভ হইতে আরও বিশ সহস্র সৈন্য তাহার সাহায্যার্থে দিলেন। কিন্তু ছাংগ্রাই আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তং থংজার শাসনকর্তা হিংজচুর অধীনে দশহাজার এবং তংগুর শাসনকর্তা রেমাচুর সংগে দশ হাজার সৈন্য দিয়া মণ্ড্রুমের পথে .... শাসনকর্তা ছাদোয়ং এর তত্ত্বাবধানে দশহাজার সৈন্য দিয়া ছারংকামার পথে, দালাকের শাসনকর্তা ক্যচুঙের সহিত দশহাজার সৈন্য দিয়া দালার পথে, ... নামক শাসন কর্তাকে দশ হাজার সৈন্য দিয়া রচ্চারুইর পথে, মাইয়ং এর শাসন কর্তা থেচুকে দশ হাজার এবং চিংথোজার শাসন কর্তা লাচুইএর অধীনে দশহাজার সৈন্য দিয়া ছালোক্যার জল পথে প্রেরণ করেন। মন্ত্রী নিজে বিশ হাজার রিজার্ভ সৈন্য, পঞ্চাশ হাজার অপরাপর সৈনিক এবং ত্রিশ হাজার বাঙ্গালী কুলী সমভিব্যাহারে চানীর পথে যাত্রা করিলেন। এইরূপ প্রত্যেকেই যথাস্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

এতদ্ভিন্ন বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তংথংজার শাসনকর্তার নিকট পেঁগো রাজ্য থাকিবে। পেগুরাজ বাধা দিতে চাহিলে তোমরা বলিবে "আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই। মঘরাজ মিত্রতা স্থাপনের নিমিত্ত এক পরমা সুন্দরী রমনী উপহার লইয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। পরে তোমরা স্ত্রী লোকটিকে সুসজ্জিত করিয়া দেখাইও। দালার পথযাত্রী ক্যচুংকেও এইরূপে শ্যামরাজাকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য তাঁহাদের সংগে এক একটি সুন্দরী রমনীও দিয়াছিলেন। অনন্তর মন্ত্রী প্রবর ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, তিনি স্বয়ং চাকমা রাজার রাজধানী (উচ্চব্রহ্মে) মইচাগিরি আক্রমণ করিবেন, সুতরাং উচ্চ ও নিম্নব্রহ্মের সকলে সাবধানে থাকিবে। যখন যাহা ঘটে, যেন অবিলম্বে তাঁহার কাছে সংবাদ প্রেরিত হয়।

মন্ত্রী ছাংগ্রাই তংদাগ্র নগরে উপস্থিত হইয়া চান্দাই নামা জনৈক শাসনকর্তাকে একখানি পত্র সহ চাকমা রাজার দরবারে দূতরূপে পাঠাইলেন। পত্রে উল্লেখিত হইল, মঘরাজা এক পরমাসুন্দরী যুবতীর সহিত তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। চান্দাই

নিজমুখেও এতাদৃশ বিবরণী বেশ সাজাইয়া গুচ্ছাইয়া বলিলেন। চাকমা রাজা ইহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া চান্দাইকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর নিমিত্ত একটি হস্তী, একখানি স্বর্ণহার, একখানি সুবর্ণ যাঁতি, দুইটি ঘোড়া, সুবর্ণ নির্মিত রেকাব ও জিন এবং একটি সোনার থোকদান পারিতোষিক লইয়া স্বীয় মন্ত্রী ব্রাচ্মীকে পাঠাইলেন। ব্রাচ্মী আসিতেছে শুনিয়া ছাংগ্রাই সৈন্য বাহিনী পোচন্দাও পাহাড়ে লুকাইয়া রাখিলেন। নিজে মাত্র কয়েকজন লোক লইয়া রহিলেন। ব্রাচ্মী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে এক সুন্দরী রমণী প্রদর্শিত হইল। অনন্তর এই যুবতীকে লইয়া যাইতে লোকজন পাঠাইবার নিমিত্ত পত্রদিয়া ব্রাচ্মীকে বিদায় করিলেন। ব্রাচ্মী প্রত্যাবৃত হইয়া রাজার কাছে সুন্দরীর অলৌকিক রূপলাবন্য বর্ণনা এবং ছাংগ্রাইএর (কূটনীতি প্রসূত) পরিচয়ানুসারে যুবতীকে মঘরাজ মেংগদির সহোদরা বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। পরিচয় শুনিয়া চাকমা রাজা আরও আহলাদিত হন এবং সবিশেষ আড়ম্বর সহকারে রাজসহোদরাকে আনয়নের জন্য অনেক লোক পাঠাইলেন। মন্ত্রী এই রমনীর সহিত একশত হস্তী ও চাকমা রাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিতে ঢাকার শাসন কর্তা রেয়ংকে দশহাজার সংগে সৈন্য লইয়া প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রেয়ংকে গোপনে বলিয়া দিলেন, চাকমা রাজা নৃত্যগীতাদি অতিশয় ভালবাসেন, মদ্যসেবীর অপরদিকে দৃষ্টি থাকে না, সুতরাং সুযোগ পাইলেই আপনি সুবিধা করিয়া লইবেন। পরে কাঁইচার শাসনকর্তা ওয়ান্টবোর সংগেও দশ সহস্র সৈন্য দিয়া পশ্চাদিক হইতে আক্রমণের নিমিত্ত পাঠাইলেন।

এদিকে রজনী সমাগমে চাকমা রাজা ইয়ংজ অনল লুব্দ পতঙ্গ প্রায় প্রমোদ নিকেতনে নৃত্য গীতাদিতে প্রমত্ত আছেন, এমন সময়ে রেয়ং যুবতীকে আনিয়া তদীয় করে সমর্পন করিলেন। রাজা অতিশয় আনন্দের সহিত যুবতীকে পাশ্ববর্তী আসনে উপবেশন করাইয়া পূনরায় আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন হইলেন। রাত্রি প্রায় বারটার সময় রেয়ং চতুর্দিকে আক্রমণ করেন। ওয়ান্টবো ও পশ্চাদভাগের জংগল পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছাংগ্রাই এইরূপে দলে দলে ক্রমশঃ অপর সমুদয় সৈন্য পাঠাইয়া পরিশেষে দলবল সহ স্বয়ং যোগদান করিলেন। এখানে তাহাদিগকে কোন যুদ্ধ ক্লেশ পাইতে হয় নাই। অতি সহজেই চাকমা রাজ ইয়াংজ এবং মধ্যম পুত্র চোফু ও কনিষ্ঠ পুত্র চৌতুকে বন্দী করিয়া মইচাগিরির পর্বতাকীর্ণ নগর মধ্যবর্তী রাজ প্রাসাদ অবরোধ করেন। সেখানেও বিনাক্লেশে যুবরাজ চজুং, রাণী তিনজন, দুই রাজাকন্যা এবং দাস দাসীগণকে বন্দী করিলেন। অতঃপর মন্ত্রী প্রবর ছাংগ্রাই ৬৯৫ মঘাব্দের (বাংলা ৭৪০ সাল) ২রা মাঘ চাকমা রাজা এবং তদীয় তিনরাণী, তিনপুত্র, দুইকন্যা ও দাস

দাসীদিগের সহিত রেয়ংকে মঘরাজ মেংগদি সমীপে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে চাকমা রাজ্য অতি সহজেই মঘরাজার করতলগত হইল। অবশেষে ১৩ই মাঘ বিজিত রাজ্য হইতে পঞ্চাশটি হস্তী, কুড়িটি গয়াল, অপরিমিত স্বর্ণ–রৌপ্য এবং দশ সহস্র চাকমা প্রজা লইয়া প্রধানমন্ত্রী নিজেও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মন্ত্রী বর রাজাংগ্রা ছাংগ্রাইর কর্মদক্ষতায় অতিশয় পরিতুষ্ঠ হইয়া আরাকানাধিপতি মেংগদি তাঁহাকে "মাহাউছা ওয়ান্না" অর্থাৎ মহাপ্রাজ্ঞ খেতাব ও একখানি স্বর্ণমন্ডিত পাল্কী উপহার প্রদান করেন এবং হস্তীর উপর চড়িয়া যাতায়াতের অনুমোদন করিলেন। ইহাছাড়া তাঁহার পুত্র অংজাউর সংগে চাকমারাজার কনিষ্ঠাকন্যার বিবাহ দিলেন। জ্যোষ্ঠা কন্য চমিখাঁকে মেংগদি নিজেই রাখিয়া দেন। অনন্তর চাকমা রাজা ইয়ংজকে আরাকানের অন্তঃপাতী ক্যমুছা নামক স্থানের কাফ্যা জাতির আধিপত্য অর্পন করেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠপুত্র চজুং ও মধ্যমপুত্র চোফ্রুর হস্তে যথাক্রমে কিউদেজা ও মিঃ রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হয় এবং কনিষ্ঠপুত্র চৌতুকে কাংজা নামক স্থানের জলকর তহলশীলদার দিয়া নিকটে রাখেন। অপর দশসহস্র চাকমা প্রজাকে এংখ্যাং এবং ইয়ংখ্যাং নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। সংগে সংগে তাহাদের পূর্বতন উপাধি পরিবর্তিত করিয়া দৈংনাক আখ্যা প্রদান করিলেন।

এতাদৃশী অধীনতায় জীবন যাপন রাজপুত্রত্রয়ের ক্রমেই অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। ৭০৫ মঘাব্দে (১৩৪৪ খৃঃ অঃ) মেংগদি লিম্রু যাত্রা করিলে তাঁহারা তিন ভ্রাতাই একত্রযোগে পোচন্দাও পার হইয়া উচ্চ ব্রহ্মে পলাইয়া গেলেন। মঘরাজা ইহা শুনিয়াও কোন উচ্চ বাক্য করিলেন না। অনন্তর জ্যৈষ্ঠভ্রাতা চজুং (সূর্য্যজিত) ভূতপূর্বাবশিষ্ট প্রজাগণকে লইয়া মংজাগ্রু নামক স্থানে রাজত্ব আরম্ভ করেন। মধ্যম ভ্রাতা চৌফ্রু (চন্দ্রজিত) ক্যজম রাজার নিকট হইতে "মংরেনা" খেতাব এবং প্রুম রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। কনিষ্ঠ চৌতু (শত্রুজিত) চাখাম নামক রাজার অধীনে থাকিয়া ক্রমে ৭২৪ মাঘিতে (১৩৬২-৬৩ খৃঃ অঃ) "তারদ্যা" উপাধি ও আমায়ু দেশের শাসনভার লাভ করেন।" (চাকমা জাতিঃ সতীশ ঘোষ পৃঃ ২০-২৩)।

চাকমা জাতির ইতিহাসে দৈংনাক (তৈনটংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যা) দের উৎপত্তির কাহিনী ইহাই। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, আরাকানাধিপতি কর্তৃক ধৃত চাকমা রাজা অরুনযুগের (ইংয়াজ) যে দশসহস্র প্রজাকে এংখ্যাং এবং ইয়ংখ্যাং নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং সংগে সংগে তাদের পূর্বতন উপাধি পরিবর্তিত করে দৈংনাক বা দৈন্‌নাক আখ্যা প্রদান করা হয় তারা আদৌ চাকমা ছিল কিনা প্রশ্ন থেকে

যায়। আরাকানী ভাসায় দৈংনাক অর্থে যোদ্ধাকে বোঝায়। সেই প্রজাগণ নিশ্চয়ই যোদ্ধা ছিল কিংবা যোদ্ধা হিসেবে গণ্য ছিল। কোন রাজার সৈন্য দলে স্বজাতীয় যোদ্ধাব্যতীত বিভিন্ন জাতি গোত্রীয় লোক থাকে। অতএব সেই দৈংনাকেরা কোন্ জাতি বা গোত্রীয় ছিল নিশ্চয় করে বলা যায় না।

অপরপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম আদিবাসী চাক উপজাতির উৎপত্তির ইতিহাস ও প্রায় তদনুরূপ। দৈংনাকদের উৎপত্তির প্রচলিত ইতিহাসের সাথে চাক উৎপত্তি কাহিনীর তেমন কোন পার্থক্য নেই। সুধী পাঠকবৃন্দ নিম্নবর্ণিত বিবৃতি থেকে বুঝতে পারবেন।

"আরাকান রাজা মাং ভিলুর পুত্র রাজা মাংথির (মেংগদি?) শাসনামলে চাক রাজার নাম ছিল য়েংচো। তাঁর রাজধানীর নাম মিছাগিরি। মন্ত্রী কোরেংগ্রী লামুর শাসনাকর্তার পরামর্শক্রমে এক অদ্ভুত উপায়ে মিছাগিরি আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তিনি চারজন সেনাপতির নেতৃত্বে প্রত্যেকের সংগে এক একজন সুন্দরী যুবতীসহ সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন পথে মিছাগিরি পাঠালেন। এক দূত মারফত য়েংচোর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হল যে রাজা মাংথি নিজ ভগ্নী ব্রাহ্মীকে উপহার দিতে চান। প্রস্তাবে খুশী হয়ে রাজা য়েংচো আরাকানী দূত সাংতাংকে প্রচুর অর্থ আর একটি হাতী উপহার দেন এবং বলেন যে, ৬৯৫ মঘীর তাপোথায় মাসের ১২ তারিখ (১৩৩৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ১২ তারিখ) তিনি ব্রাহ্মীকে গ্রহণ করবেন। নির্দিষ্ট দিনে ১০,০০০ হাজার সৈন্য সহ রেজং নামক আরাকানী সেনাপতি ব্রাহ্মীকে মিছাগিরি নিয়ে আসে। ব্রাহ্মীর রূপ দেখে য়েংচো মুগ্ধ হন। এদিকে মূল আরাকানী বাহিনী হঠাৎ রাত্রিতে রাজ প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং তার দুই পুত্র ও দুই কন্যার সাথে য়েংচো বন্দী হন। একমাত্র জ্যৈষ্ঠ পুত্র চোচুং তার অনুগত সৈন্যদের নিয়ে সুদূর ব্রহ্মদেশে পালিয়ে যান। আরাকান রাজ মাংথি রাজা য়েংচোকে ক্যখকা রাজ্যের শাসনভার, রাজকুমার চৌপ্রুকে মিঙ রাজ্যের শাসনভার, রাজকুমার চৌতুংকে কঙ রাজ্যের শাসনভার দেন এবং রাজকুমারী চোমে খানকে নিজে বিয়ে করেন। পরে চৌপ্রু বার্মায় পালিয়ে যান। চাকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে এবং তাদেরকে পূর্ববর্তী স্থান থেকে উঠিয়ে এঙ নদী, রো নদী প্রভৃতির তীরে বসবাস করার ব্যবস্থা হয়। এভাবে সুবিখ্যাত চাকরাজ্য ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দের দিকে ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ রাজ পুত্র আনুমানিক ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে আসেন। অন্যান্য চাকরা তাকে অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে লামা মহকুমায় পৌছে। অনেকে তাঁর খোঁজ না পেয়ে আরাকানে ফিরে যায়।" (মংমং চাক, চাক উপজাতি পরিচিতি; সাময়িকী গিরি নির্ঝর ১ম সংখ্যা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক

ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি)। এই হলো চাক জাতির ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

চাকজাতির এই কাহিনীর সাথে সতীশ ঘোষের চাকমা জাতি ইতিহাসে বর্ণিত দৈংনাকদের উৎপত্তির কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নামগুলি বা স্থান সমূহের বানানে এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য ব্যতীত উভয় কাহিনীই অবিকল এক। সতীশ ঘোষের চাকমা রাজ ইয়ংজ চাক ইতিহাসের য়েংচো, চাকমা রাজধানী মইচাগিরি চাক ইতিহাসের মিছাগিরি। ব্রহ্মদেশীয় মন্ত্রী ব্রাচ্‌মীকে চাক ইতিহাসে রাজকুমারী ব্রাহ্‌মী এবং চাকমা রাজা মারেক্য জয় ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসার তারিখটিই চাকদের কাহিনীতে আনুমানিক ১৩৬৪ খৃঃ অঃ ধরা হয়েছে। রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ও গবেষক বাবু অশোক কুমার দেওয়ান তাঁর চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ) প্রদত্ত মন্তব্য খুবই প্রনিধানযোগ্য।

তাঁর মন্তব্য এইঃ "তাহলে দেখা যায় এই যাবৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত চাকমা জাতির ইতিহাসের এই অধ্যায়টি চাক জাতিও নিজের বলে দাবী করেছে। এই কাহিনী কি চাকরা আমাদের কাছ থেকে চুরি করেছে? না আমরাই তাদের কাহিনীকে আমাদের বলে চালিয়ে দিচ্ছি? সন্দেহ নেই যে, চাকরাও এই কাহিনী দেঙ্গ্যাওয়াদি বা অনুরূপ কোন পুঁথি থেকে সংগ্রহ করেছে। অতএব আমাদের নির্ণয় করা দরকার দেঙ্গাওয়াদি কাহিনীকার সাক জাতির নাম আসলে কাদের কাহিনী বিবৃত করেছেন।" (চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার- পৃঃ ৬৪, ৬৫ প্রথম সংস্করণ)।

Phayre এর History of Burma গ্রন্থটির উল্লেখ করে তিনি তাঁর ইতিহাস বিচার গ্রন্থে মন্তব্য করেনঃ- "উপরের বর্ণিত বিবরণে তথাকথিত চাকমা রাজা ইয়াংজ বা অরুন যুগের পতন কাহিনী বড় করুন। এতবড় শক্তিধর রাজা এবং একটি সমৃদ্ধজাতির এই পরিণতি তাও আবার ছলনার মাধ্যমে; যার সংগে কিনা আরাকান রাজ দুই লক্ষ সৈন্য দিয়েও সম্মুখ যুদ্ধে মুখোমুখী হতে সাহস পাননি অত্যন্ত দুঃখাবহ সন্দেহ নেই। চাকমা জাতির ইতিবৃত্তকারগণ একারণে এঘটনাকে বেশ ফলাও করে বর্ণনা করেছেন। লক্ষ্যনীয় যে, দেঙ্গ্যাওয়াদির কাহিনীকার এই ঘটনার সংগে আগেরগুলির ন্যায় অতি প্রাকৃত ঘটনায় বিবরণ যোগ করে এটিকে কল্প কথায় পর্যবসিত করেননি। কিছু অতিরঞ্জন এবং অলঙ্কারের আতিশয্য সত্ত্বেও এই ঘটনার বিবরণ আগেরগুলির তুলনায় অনেক বাস্তবসম্মত কিন্তু এতবড় একটি মহীরুহের পতন যা

তঞ্চঙ্গ্যাদের ফো-কালাং (অলংকার রাখার ঝুড়ি) ও আদি অলংকার।

প্রচন্ড শব্দে চারিপাশের বনভূমিকে প্রকম্পিত করে তোলার কথা, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় ফেইরীর, ব্রহ্ম ইতিহাসে এই ঘটনার কোন ছায়া মাত্র পড়েনি।"

সেই সময়ের আরাকান ইতিহাস ফেইরী এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ- Arakan became subordinate to pugan monarchy when Letyamegnan was placed on the throne of his ancestors. He fixed his capital at Parin. The country enjoyed rest for a long period, and there is nothing in the annals worthy of remark untill after the centure of Pugan by the mougals. In the early part of the forteenth century mention is made of invasion by the Shans whitch apparently refers to attacks by kings of Myinsaing and Panya.. (Phayre- History of Burma- p-76)

আরাকান ইতিহাসে মেংগদির রাজত্বকাল ১২৭৯ খৃঃ অঃ থেকে ১৩৮৫ খৃঃ পর্যন্ত (অবিশ্বাস্যভাবে দীর্ঘ ১০৬ বৎসর)। এই মেংগদির সময়েই উপরে দেঙ্গ্যাওয়াদির বর্ণিত ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দের মইচাগিরির পতনের ঘটনা। কিন্তু ফেইরীর ব্রহ্ম ইতিহাসে আরাকান রাজ মেংগদি কর্তৃক সাকরাজ্য জয়ের কোন বিবরণ নেই বরং Myinsaing এর শান জাতি কর্তৃক উল্টো আক্রমণেরই উল্লেখ আছে। দুটি পুস্তকে এই দুধরনের সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীত ধর্মী বক্তব্য ধাঁধার সৃষ্টি করে।"

বিভিন্ন সূত্র পর্য্যালোচনা করে এই কাহিনী চাকদেরই দাবী করা সহজ বলে শ্রী দেওয়ান মন্তব্য করেন, "বর্তমানের চাকজাতি নানা কিছুর বিচারে উচ্চ ব্রহ্মের কাদু জনগোষ্ঠীর একটি শাখা বলে অনুমিত হয়। সে কারণে চাকদের পক্ষেই সাক পরিচয় দেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং যদিও ইয়াঙ্জ কাহিনীর যথার্থ্যতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে তবুও সেকাহিনী তাদেরই দাবী করা সহজ।" (প্রাগুক্ত- পৃঃ ৬৭)

দৈংনাক বা তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তির কাহিনী অনুসন্ধানকালে আরাকান এবং উচ্চব্রহ্মেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থেকে যায়। চাকমা জাতির ইতিহাসবেত্তাগণের সুদীর্ঘকালের ব্যাপক গবেষণার ফলশ্রুতিতে আরাকান বা ব্রহ্ম ইতিহাসের অতলগর্ভে দৈংনাক বা তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রতিসন্ধির সম্ভাব্যতা সমধিক বলে প্রতীয়মান হয়। এই প্রসঙ্গে Sir Arther Phayre তাঁর ১৮৪১ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত "An account of Arakan" নামক নিবন্ধে দৈংনাকদের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর নিবন্ধে তিনি দৈংনাকদের যে বিবরণ দিয়েছেন তা সংক্ষিপ্ত হলেও খুবই প্রনিধানযোগ্য। তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপঃ "The

remaining hill tribes are the Doingnak and the Murung. They both inhabit the upper course of the Mayariver. The language of the first is a corrupt Bengali. They call themselves kheim-ba-nago. Of their descent I could tearn nothing, probably they may be the offspring of Bengalees carried in to the hills as slaves, where their physical appearance has been modified by change of climate. In religion they are Buddhists" (Lient Phayre. An account of Arakam, Journal of the Asiatic society of Bengal 1841)

দৈংনাকরা বর্তমানে আরাকানের রাসিডং ভুসিডং মংদু ক্যাক্তও কতিপয় জায়গায় বাস করে। উচ্চ ব্রহ্মেও তারা বসবাস করছে বলে জানা যায়। ১৯২১ সালে বর্মার আদমশুমারীতে তাদের সংখ্যা ৪৯১৫ জন ধরা হয়েছিল। দীর্ঘ চুয়াত্তর বৎসরে তাদের সংখ্যা কত হবে তা অনুমান করা কঠিন নহে।

শ্রী অশোক কুমার দেওয়ান তাঁর চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার গ্রন্থে ফেইরীর উপরোক্ত বিবৃতিতে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন। - "চাকমাদের একটি দল দৈংনাকেরা সুদীর্ঘকাল পূর্ব থেকে আরাকানে বসবাস করে আসছে। দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় তাদের কথা আমরা প্রায় ভূলেই গিয়েছিলাম। তাদের কথা নূতন করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় Sir Arther Phayre তাঁর ১৮৪১ সালে প্রকাশিত An account of Arakan নামক নিবন্ধে। ফেইরী বলছেন যে, দৈংনাক্রা নিজেদের "খেইম বানগো" বলে পরিচয় দেয়। এই "খেইমবানগো" কথাটির অর্থ কি? খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আরাকানী ভাষায় বা প্রতিবেশী কোন উপজাতীয় ভাষায় শব্দটির কোন অর্থ হয়না। সুতরাং আমাদের কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। অনুমান হয় যে ফেইরীর সঙ্গে আলাপ করার সময় তারা আসলে নিজেদের চম্পকনগরের লোক বলেই পরিচয় দিয়েছিল। ফেইরী সেই সময় ছিলেন লেফ্টেন্যাট পদমর্য্যাদার একজন তরুন অফিসার। সেই তরুণ বয়সে তিনি আরাকানী ভাষা আয়ত্ত্ব করেছিলেন বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ কোন আরাকানী দোভাষীর মাধ্যমেই তাঁদের কথাবর্তা চলেছিল। আরাকানী ভাষায় শব্দের শেষে হলন্ত ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়না। অতএব চম্পক নগর শব্দটির উচ্চারণ আরাকানী দোভাষীর উচ্চারণে "চেইম্বপানগো" হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ এই চেইম্পানগো শব্দটিকে শোনার ভূলে হোক বা নোট করার ভূলে হোক ফেইরী "খেইমবানগো" লিখেছেন। এটি নিছক অনুমান। এই

স্বকীয় পোষাক ও অলংকারে তঞ্চঙ্গ্যা কিশোরী।

অনুমান ছাড়া দৈংনাকরা নিজেদের খেইমবানগো হিসাবে পরিচয় দেওয়ার আর কী অর্থ হতে পারে আমরা ভেবে পাই না। দৈংনাকদের মধ্যে বরাবরই চম্পক নগরের বিজয়গিরির রাজ্যাভিযান সম্পর্কীত জনশ্রুতি প্রচলিত এই ধারনার কারণ এই যে আরাকানবাসী দৈন্নাকদেরই প্রত্যাগত অংশ তংচঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের প্রতিটি লোকই আজ পর্য্যন্ত সেই একই বিশ্বাসে গভীরভাবে বিশ্বাসী। দৈন্নাকদের সংগে এ অঞ্চলের জনগণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে কম করে হলেও প্রায় ৩০০ বছর। ইতিপূর্বে আলোচনা অনুযায়ী রাধামোহন ধনপুদি উপাখ্যান সহ চম্পকনগরের বিজয় গিরির গোটা কাহিনী যদি উনবিংশ শতাব্দী বা তারও কিছু পূর্বে রচিত বলে অনুমিত হয়, তবে দৈন্নাকদের মধ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ফেইরীর আমলে সেটি প্রচলিত হওয়ার কথা নয়। সুতরাং রাজা বিজয় গিরির নেতৃত্বে চম্পকনগর থেকে দক্ষিণাভিমুখে যুদ্ধাভিযানে আসার পর তারা আর পূর্বস্থানে ফিরে না গিয়ে এ অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেছিল। দৈন্নাকসহ চাকমা তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সে বিশ্বাসের মূলে অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।" (প্রাগুক্ত) চাকমা রাজা অরুনযুগ বা ইয়ংজ এর আরাকান রাজা মেংগদির হাতে পরাজয় বরণ ও দশ সহস্র চাকমা প্রজাসহ সপরিবারে বন্দী হবার ঘটনা সত্য কিংবা মিথ্যা যাই হোক না কেন আরাকান বা উচ্চ ব্রহ্মে দৈংনাক নামধেয় একটি পৃথক জাতি বা জনগোষ্ঠী থাকার কথা কদাপি মিথ্যা নহে। দৈংনাক শব্দটি আরাকানী বলে সবাই একমত। ইহার অর্থ হল যোদ্ধা। যোদ্ধা বলে কোন জাতি থাকতে পারেনা। কোন জাতি বা রাজার সৈন্যকে বা সৈন্য দলকে যোদ্ধা বলা যায় মাত্র জাতি বলা যায় না। সেই সৈন্য দলে সেই জাতি বা রাজার স্বজাতীয় সৈন্য ব্যতীত অন্য কোন জাতির লোক থাকা অসম্ভব নহে। বৃটিশের সৈন্যদলে গুর্খা, অহমিয়া, বাংগালী প্রভৃতি জাতির লোক যেমন রয়েছে।

ফেইরী বলেছেন দৈংনাকেরা বৌদ্ধ এবং তারা মায়া নদীর (মায়ু) উর্দ্ধভাগে বসবাস করে। তাদের ভাষা বিকৃত বাংলা। তাদের ভাষা বিকৃত বাংলা বিধায় তিনি অনুমান করেন যে, তারা দাসরূপে আনীত বাংগালীদের উত্তর পুরুষ হওয়া সম্ভব। সেখানে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনে দৈহিক গঠন, আকৃতি ও চেহারার পরিবর্তন হয়েছে।

ফেইরীর এই অনুমান সঠিক নহে। কেননা, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে কোন জনগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন, আকৃতি ও চেহারায় আমুল পরিবর্তন কোনদিন সম্ভব হতে পারে না। মংগোলীয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে একই জলবায়ুতে পাশাপাশি শত শত বৎসর বাস করেও কোন বাংগালীর (অমংগোলীয়) দৈহিক গঠন,

আকৃতি ও চেহারার পরিবর্তন হয়ে মংগোলীয় উপজাতীয়তে রূপান্তরিত হয়েছে বলে কোন দৃষ্টান্ত এযাবৎ দেখা যায়নি। বৈবাহিক কারণে রক্তের সংমিশ্রণ ব্যতীত দৈহিক গঠন, আকৃতি ও চেহারার পরিবর্তন সম্ভব নহে। কাজেই ফেইরীর এই সিদ্ধান্ত আমরা বাতিল করতে পারি এবং বলতে পারি দৈংনাকরা নৃতাত্ত্বিক বিচারে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার লোক বিধায় প্রাচীন Taï বা Shan দের গোত্রীয়।

আরাকান ও উচ্চব্রহ্মে অপরাপর মংগোলীয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জাতিগোষ্ঠীর দৈংনাকরা অন্যতম তা প্রাচীন আরাকান ইতিহাসে পাওয়া যায়। যথাঃ "প্রাচীন আরাকান রাজ্য ছিল মোঙ্গল, তিব্বত ব্রহ্ম জনগোষ্ঠী ও মুরুং, খুমী, চাক, সিন, সেন্দুজ, ম্রো, খ্যাং, ডইনাক, মারুমিউ, প্রভৃতি কিরাত উপজাতি অধ্যুষিত দেশ।" দ্রষ্টব্যঃ (প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসীঃ আবদুল হক চৌধুরী। বাংলা একাডেমী ঢাকা। প্রথম প্রকাশঃ ১৪০০ সাল, জানুয়ারী ১৯৯৪ পৃষ্ঠা তিন)। পুস্তকে বর্ণিত ডৈনাকই দৈংনাক। অপরপক্ষে চাক বলতে চাকমা কিংবা চাক কাকে বুঝানো হয়েছে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চাকমা এবং দৈংনাকদের একসংগে ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায়। ধর্ম এবং ভাষার সাদৃশ্য থাকাতে উভয় জাতিসত্ত্বার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও মৈত্রী থাকার কথা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। আরাকানীদের সংগেও দৈংনাকদের কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিল না। অন্ততঃ ইতিহাসে কোন দ্বন্দ্বের উল্লেখ নেই। সেইজন্য অদ্যাবধি আরাকানে ও উচ্চ ব্রহ্মে দৈংনাকগণ শান্তিতে বসবাস করছে।

আরাকানীদের সংগে চাকমাদের সুদীর্ঘকাল ধরে, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিল। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিণতি এমন হয়েছিল যে আরাকানীদের (মগদের) অত্যাচার বেড়ে যায় এবং চাকমাগণ আরাকানে থাকতে পারেনি। তারা আরাকান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। স্বদেশ ভুমি চম্পক নগর ফিরে যাবার জন্য তখন শ্লোগান রচিত হয় তা উদ্ধৃত করা হল।

চল বাব ভেই যে যে যে
চম্পক নগরত ফিরি যে।।
এলে মৈসাং লালস নেই
ন এলে মৈসাং কেলেশ নেই।।
ঘরত থেলে মগে পায়
ঝাড়ৎগেলে বাঘে খায়।।

মগে ন পেলে বাঘে পায়
বাঘে ন পেলে মগে পায়।।

অর্থাৎ-
চল বাপ্ ভাই চল যাই
চম্পক নগরে ফিরে যাই।
আস্‌লে মৈসাং লালসা নাই
না আস্‌লে মৈসাং ক্লেশ নাই।
ঘরে থাকলে মগে পায়
ঝাড়ে (জংগলে) গেলে বাঘে খায়।
মগে না পেলে বাঘে পায়
বাঘে না পেলে মগে পায়।

এতে বোঝা যায়, চাকমাদের অবস্থা কি নিদারুণ কষ্টকর হয়েছিল তখন। চাকমাদের সংগে ঘনিষ্ঠতা থাকায় এবং উভয়ের ভাষা প্রায় একই হবার কারণে দৈংনাকরাও আরাকানীদের হাতে নিগৃহীত হতে পারে অনুমান করলে ভূল হবে না। কারণ চাকমাদের সংগে দৈংনাকদের একাংশ ও আরাকান ত্যাগ করে বলে ইতিহাসে দেখা যায়।

চাকমা ইতিহাসের তথ্য অনুসারে মৈসাংরাজায় পুত্র মারেক্যা ও তৈন সুরেশ্বরীর নেতৃত্বে চাকমারা ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের আলীকদম নামক স্থানে পালিয়ে আসতে সমর্থ হন। এবং তথায় তৎকালীন চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা মোঃ জালাল উদ্দীন এর অনুমতিক্রমে ১২ খানি গ্রামের সমন্বয়ে একটা ক্ষুদ্র চাকমা রাজ্য গঠন করেন। উক্ত বার খানি গ্রামকে বলা হত বার তালুক। তখন তৈনসুরেশ্বরীর নামানুসারে মাতামুহরীর একটি উপনদীর নাম তৈনসুরেশ্বরী রাখা হয়।

শ্রী অশোক কুমার দেওয়ান চাকমা ইতিহাসে উল্লিখিত মৈসাং কিংবা মারেক্যা আসলে চাকমা রাজা কিনা এবং আরাকান থেকে চাকমা প্রজাদের নিয়ে পলায়নের ইতিহাস বিভ্রান্তি মূলক বলে তাঁর "চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার" গ্রন্থে (পৃঃ ৭৪, ৭৫, ৭৬) উল্লেখ করেছেন।

চাকমাদের রাজা বা দলপতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য যাই থাক না কেন চাকমাগণ মগদের অত্যাচারে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়ে আরাকান যে ত্যাগ করেছিল তা ঐতিহাসিক সত্য। তাদের সংগে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে হয়ত একই জাতিভুক্ত এই বিশ্বাসে দৈংনাকদের কিয়দংশ তাদের সঙ্গে আরাকান ত্যাগ করে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে

আলী কদমের তৈনসুরেশ্বরী নদী অববাহিকায় বার তালুকে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতে থাকে।

দৈংনাকরা যে বৌদ্ধ তা History of Burma রচয়িতা তৎকালীন আরাকান বিভাগের কমিশনার ফেইরী উল্লেখ করেছেন। তাদের সংগে বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র ত্রিপিটক ছিল। চাকমাগণও বৌদ্ধ। শত অত্যাচাড়িত ও নিপীড়িত হলেও তারা আরাকান ত্যাগের সময় বৌদ্ধ ধর্মকে ত্যাগ করেনি। তাদের পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তারা আরাকান ত্যাগ করার প্রাক্কালে ধর্মশাস্ত্র সংগে বহন করেছিল। কিন্তু মূল ত্রিপিটক দুষ্প্রাপ্যতার কারণে অথবা তাদের কাছে না থাকাতে তারা মূল ত্রিপিটক সংগে নিতে পারেনি। দৈনন্দিন কাজে বা মৃত্যু বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় সূত্র মূল ত্রিপিটক হতে লিপিবদ্ধ (Copy) করে নেয়। ঐ সূত্রগুলির প্রত্যেকটি এক একটি তারা এবং সম্মিলিত নাম আগরতারা। এযাবৎ মোট আটাশটি তারার সন্ধান পাওয়া গেছে। শত্রুতাও সংঘর্ষের কারণে আরাকানীদের (আরাকানীরাও প্রথম থেকে বৌদ্ধ) কাছে অবস্থিত ত্রিপিটক হতে সূত্র অনুলিপি করা কোন চাকমার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। লক্ষনীয় যে, যে সব দৈংনাক আরাকান ত্যাগ করে আলীকদম বা তৈনছড়িতে চলে যায় তাদের কোন আগরতারা ছিল না- বরঞ্চ মূল ত্রিপিটক ছিল বলে ধারনা করা যায়। নতুবা তারাও সংকলিত সূত্র বা আগরতারা কিংবা অন্য কোন নামধেয় ধর্মশাস্ত্র সংগে বহন করত। কাজেই ইহা অনুমান করা ভুল হবে না যে, চাকমাগণ দৈংনাকদের কাছে অবস্থিত ত্রিপিটক থেকেই আগরতারা লিপিবদ্ধ করে থাকতে পারে তবে ইহা নিছক অনুমান মাত্র।

কথিত আছে চাকমাগণ চট্টগ্রাম, রাঙ্গুনীয়া ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করলে আলীকদম ও আরাকানের বহু দৈংনাক্ স্বজাতীয় বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে চাকমাদের সান্নিধ্যে বসবাস করার উদ্দেশ্যে তত্রত্য অঞ্চলে চলে আসে। আলীকদম থেকে কিছু দৈংনাক্ হ্নাক্ষ্যংছড়ি, লামাও বর্তমান কক্সবাজার জেলার টেক্‌নাফ্, উখিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। অদ্যাবধি সেই সব জায়গায় তারা বসবাস করছে।

উত্তরদিকে আসার পথে বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি, রুমা, হোয়াক্ক্ষ্যং, রাজবিলা, শুকবিলাস, বাংগালহালিয়া, নারানগ্রী, কাপ্তাই উপত্যকা অঞ্চল, নোয়াপতং, রাইংখ্যং উপত্যকার সম্পূর্ণ অঞ্চল, হোয়াগ্গা, বড়াদম, ঘাগড়া, রইস্যাবিলি এসব অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। চাকমা রাজা ধরম বক্স খাঁর আমলে জনৈক ফাগ্র নামক ব্যক্তিকে দলনেতা করে একজোড়া হাতী ও বহু স্বর্ণালঙ্কারাদি উপঢৌকন দিয়ে চারিহাজার দৈংনাক এতদঅঞ্চলে (স্থায়ী) বসবাসের নিমিত্ত রাজা ধরম বক্স খাঁর নিকট

অনুমতি প্রার্থনা করে। রাজা ধরম বক্স খাঁ তাদেরকে এতদঅঞ্চলে বসবাসের অনুমতিদেন কিন্তু স্বজাতি চাকমা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি বলে জনশ্রুতি আছে।

তখন সমতল জমিতে কৃষি পদ্ধতি সবেমাত্র আরম্ভ হয়। অধিকাংশ প্রজারাই জুমচাষের উপর নির্ভরশীল ছিল। দৈংনাক গণও জুমচাষী ছিল। চাকমা রাজ সরকারের জুম তৌজিতে তাদেরকে চাকমা উল্লেখ না করে তৈনৃটংগ্যা (অধিকাংশ আলীকদমের তৈনছড়ি থেকে আগত বলে) নামে উল্লেখ বা তৌজিভুক্ত করা হল। তৈনটংগ্যা শব্দটি ক্রমে ক্রমে 'তঞ্চঙ্গ্যা' এই লিখিত রূপ লাভ করে।

চাকমা রাজা ধরম বক্স খাঁ দৈংনাক বা তঞ্চঙ্গ্যা দিগকে স্বজাতি চাকমা হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও অবহেলা করেছিলেন বলে মনে হয়না। কেননা, চাকমা হেডম্যানের সমমর্য্যাদা সূচক হেডম্যান পদে কতিপয় তঞ্চঙ্গ্যাকেও নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে ১০০ হোয়াগ্গা মৌজা, ১০৮ মানিকছড়ি মৌজা, ১২০ ছাক্রাছড়ি মৌজা, ১৩০ বারুদগোল্লা মৌজা, ১৩১ বল্লালছড়া মৌজা, ৩৩৩ ঘিলাছড়ি মৌজা, ১১৭ কৌশল্যা ঘোনা মৌজা বান্দরবানের তম্ব্রু মৌজাগুলির হেডম্যান সকলেই তঞ্চঙ্গ্যা। উল্লেখ্য যে, চাকমা রাজা ব্যরিষ্টার দেবাশীষ রায়ের আমলে চাকমা অধ্যুষিত ১১৭ কৌশল্যাঘোনা মৌজার চাকমা হেডম্যান লাল মোহন তালুকদার মারা গেলে ঐ মৌজাবাসী শ্রী যতীন তঞ্চঙ্গ্যাকে হেডম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়। চাকমা হেডম্যানদের যে মর্য্যাদা রাজদরবারে প্রদান করা হয়, তঞ্চঙ্গ্যা হেডম্যানদেরকেও সেই মর্য্যাদা প্রদান পূর্বকাল থেকেই চলে আসছে। দৈংনাকগন এতদঅঞ্চলে আগমণের কিয়ৎকাল পরে রাজা ধরমবক্স খাঁর বসবাসের সুবিধার জন্য চট্টগ্রাম শহরে একটি পাকা দালান তৈরী করিয়ে রাজাকে উপহার প্রদান করে। ঐ দালান লালকুঠি নামে বিখ্যাত এবং কমিশনার বাহাদুরের বাসভবন রূপে ব্যবহৃত হয়। রাজা নিজের খাস মৌজা ১১৬ রাঙ্গামাটি, ৫৯ বন্দুক ভাঙ্গাতে ও দৈংনাকদের বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন। ১১৬ রাঙ্গামাটি মৌজায় অদ্যাবধি বহু তঞ্চঙ্গ্যার বসবাস দেখা যায়।

বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা সরকারী পূনর্বাসন বিভাগে এসিষ্ট্যান্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার চাকুরী করার সময় বন্দুক ভাঙ্গা মৌজায় বেশ কয়েক পরিবার চাকমার সন্ধান লাভ করেন যারা নিজেদের তঞ্চঙ্গ্যা বলে তাঁর কাছে উল্লেখ করেন। ঐ মৌজার খারেক্যাং এলাকায় এখনো তঞ্চঙ্গ্যা পাড়া নামে একটি স্থানের নাম আছে। উক্ত মৌজার স্বনামধন্য ও বিখ্যাত ব্যক্তি প্রয়াত ধর্ম মোহন কার্বারী চেয়ারম্যান (তিনি দীর্ঘদিন ঐ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন) নিজেকে ধন্যাগোঝার (তঞ্চঙ্গ্যার অন্যতম গোঝা)

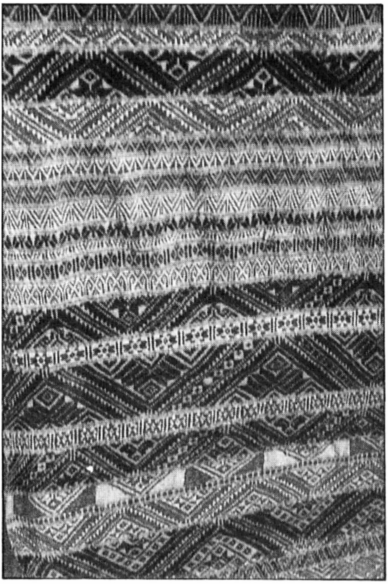

তঞ্চঙ্গ্যা আলাম (ডিজাইন ক্লথ)।

তভাদাঘির লোক বলে প্রকাশ করতেন। অর্থাৎ তাঁর পূর্বপুরুষ ঐ গোঝার লোক (তঞ্চঙ্গ্যা) ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রী সাধন মানিক কার্বারী সমাজেয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত। অন্যতম প্রবীন ও বিখ্যাত ব্যক্তি শ্রী মিয়াচান তালুকদার ও নিজেকে তঞ্চঙ্গ্যা বলে উল্লেখ করতেন। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী শ্রী রমেশ চন্দ্র চাকমা ও সিলেট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শ্রী চন্দ্র কুমার চাকমা তাঁদের পূর্ব পুরুষ তঞ্চঙ্গ্যা ছিলেন বলে প্রকাশ করে থাকেন।

এতদঅঞ্চলে তঞ্চঙ্গ্যাদের আগমণ ও বিকাশের ইতিবৃত্ত যাই হোক না কেন সুদীর্ঘকাল নিজেদের স্বতন্ত্র সত্ত্বার অনুভতিতে ক্রমে ক্রমে তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব কৃষ্টি, সাংস্কৃতির জন্মলাভ ঘটেছে যা এতদঅঞ্চলের অপরাপর জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি থেকে সহজেই আলাদা মনে হয়।

তঞ্চঙ্গ্যাদের ইতিহাস কোন রাজবংশ বা দলনেতার ইতিহাস নহে। তাদের ইতিহাস, তাদের সাধারণ জনমানুষেরই ইতিহাস। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্য্যায়ে তাদের অভিযান অগ্রগতি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির খতিয়ান নহে তা সমগ্র তঞ্চঙ্গ্যা জাতির অভিযান অগ্রগতি ও সাফল্যের খতিয়ান।

দৈংনাকের নব জন্মঃ ভাগ্যের সন্তান তঞ্চঙ্গ্যাগণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যানুপাতে চতুর্থ স্থানের অধিকারী তঞ্চঙ্গ্যাগণ সর্বাধিক ভাগ্যবান বলে মনে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর উপজাতি সমূহের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম ও আর্থসামাজিক যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, জনসংখ্যায় কম হলেও তঞ্চঙ্গ্যাগণ সে অগ্রগতির মানদন্ড অর্জন করেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তঞ্চঙ্গ্যাদের কতিপয় ব্যক্তিত্ব ধর্মীয় ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

কোন ব্যক্তি বা জাতি যখন নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে, সমগ্র বিশ্বের আলোকে নিজেকে দেখতে আরম্ভ করে তখনই তার অন্তরে জাগরণ শুরু হয়। জাগরণের উজ্জ্বল রেখা বেয়ে সমগ্র বিশ্বের মংগল উৎসব তার মাঝে সমাবিষ্ট হয়। সেই ব্যক্তি বা জাতি হয় সার্থক। পরম ভাগ্যবান।

তঞ্চঙ্গ্যার সুযোগ্য সন্তান শ্রী ফুলনাথ তঞ্চঙ্গ্যা ভিক্ষু জীবনে উপসম্পদা গ্রহণ করতঃ শ্রীমৎ অগ্রবংশ ভিক্ষু (বর্তমানে মহাস্থবির) নামে বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমার) বৌদ্ধ দর্শন ও ত্রিপিটকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। বার্মায় ১৯৫৪ সাল হতে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত ষষ্ঠ বৌদ্ধ সংগীতি (আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ধর্ম মহাসম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীমৎ অগ্রবংশ স্থবির অন্যতম সংগীতিকারক (ধর্ম বিশ্লেষক) হিসেবে যোগদান করেন। সেই সময় সদ্ধর্মপ্রাণ চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় তাঁকে চাকমা রাজগুরু রূপে বরণ করার জন্য স্বদেশে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিদর্শন ও পালি ত্রিপিটকে এম. এ ডিগ্রী গ্রহণ করে ত্রিপিটকাচার্য্য উপাধি নিয়ে ১৯৫৮ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং চাকমা রাজগুরু পদে অভিষিক্ত হন।

উল্লেখ্য যে, তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বানের তিন মাস পরে তাঁর ধর্ম বিনয় রাজগৃহে সপ্তপর্নী গুহায় অরহত মহাকাশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে পাঁচশত অরহত কর্তৃক সংকলিত বা সংগৃহীত হয়। ইহা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম সংগীতি নামে অভিহিত হয়েছে। এভাবে মাঝে মাঝে সম্মেলনী বা সংগায়নের মাধ্যমে তথাগত বুদ্ধের ধর্ম ও বিনয় পরিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়ে আসছে। এযাবৎ ছয়বার এরূপ ধর্মসংগীতি বা ধর্ম সংগায়ন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এই ধর্ম মহা সম্মেলনী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এরকম গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম মহাসম্মেলনীর অন্যতম সংগীতিকারক হিসেবে যোগদান করে শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির তঞ্চঙ্গ্যাগণকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁকে ঐ সম্মেলনে তৎকালীন পাকিস্তানী বৌদ্ধদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সদ্ধর্মপ্রাণ চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেন। বিশ্বের ক্ষুদ্রতর বৌদ্ধ সম্প্রদায় চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সংগীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সমগ্র বিশ্বে নিজেদের মর্য্যাদা সুমন্নত করেছে। দ্রষ্টব্যঃ The Chatta sangayana souvenir Album. পৃঃ ৮৫।

বিংশ শতাব্দী তঞ্চঙ্গ্যাদের জন্য প্রথম সৌভাগ্য বহন করে এনেছে। তঞ্চঙ্গ্যাগণ ভাগ্যের সন্তান। কেননা, এত ক্ষুদ্র একটি জনগোষ্ঠী অতিস্বল্প সময়ে সমগ্র বিশ্বের সদ্ধর্ম পূজারীর শুভেচ্ছা ও মৈত্রী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ স্থবির এতদঅঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের পূনর্জাগরনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং অচিরেই অনেক শিক্ষিত চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা যুবক উপসম্পদা গ্রহণ করেন এবং চাকমা গ্রামে ক্যাং বা বিহার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, তৎপূর্বে চাকমা সমাজে আগরতারা অবলম্বন করে লুরীগণ বিবাহ অনুষ্ঠান, মৃতদেহের সৎকার ও অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়া, ভাতদ্যা প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে পৌরহিত্য করত। বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ অনুসারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির বিষয় লোকে একদম বিস্মৃত ছিল।

চাকমা রাণী কালিন্দী ১৮৫৬ সালে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের সংঘনায়ক শ্রীমৎ সারমেধ মহাস্থবিরকে রাজগুরু পদে বরণ করে এতদঅঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের পূনর্জাগরন এনেছিলেন। পরবর্তীকালে একশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম পরিহীন হয়ে যায়। ১৯৫৮ সালে সদ্ধর্ম প্রবর্ধক চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় শ্রীমৎ অগ্রবংশ স্থবিরকে রাজগুরু পদে বরণ করে পূনরায় এতদ্অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম পূনর্জাগরণের মহতী উদ্যোগ নেন। ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীমৎ অগ্রবংশ স্থবিরকে মহাস্থবির পদে বরণ করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে জাপানের রাষ্ট্রদূত এবং নেপালের রাষ্ট্রদূত শ্রী কিন্তিনিধি কিস্তা (পরবর্তীকালে নেপালের প্রধান মন্ত্রী) সস্ত্রীক যোগদান করেন। রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবিরের প্রচেষ্টায় এতদঅঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের পূনর্জাগরণ কি আশ্চর্য্যজনকভাবে সম্পন্ন হয় চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় তাঁর Buddhist Revival in the Chittagong Hill Tracts শীর্ষক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে চিত্তাকর্ষকভাবে সুন্দর বর্ণনা প্রদান করেছেনঃ Kalindi's reforms had far reaching effects not only on the Chakmas but also on the

Marmas and the Baruas. Since her time, Buddhism has gradually advanced at the expense of animist and other non Buddhist practices. However, the number of Chakma monks and monasteries in the Chakma country were still far-smaller than in the case of the Barua and the Marma. The great change in the Buddhist practices of the Chakmas came in the 1950's, almost exactly a hundred years after Rani kalindi and sangharaja Saramedha. In 1958, at the invitation of the Chakma Raja Tridiv Roy, the venerable Agravamsa Thera (now mahathera) came to Rangamati to be appointed the Chakma Raj guru. In 1959, 'The parbatya chattagram Bhikkhu Samiti." was established under the Rajgurus leadership and the number of Chakma and other local monks began to grow as did the number of monasteries. These effects were felt even among the smaller peoples such as Mro and khyang. The Rajguru remained in Rangamati upto 1976 and the Buddhists of Chittagong Hill Tracts recall the venerable Agravamsa's name with much gratitude. This learned Pali scholar and exponent of the Tripitaka who studied in Burma for more than ten years has left behimd a rich legacy. (দ্রষ্টব্যঃ বিংশতিতম কঠিন চীবর দান স্মরণিকা '৯৩। রাজবন বিহার, রাজবন, রাঙ্গামাটি পৃঃ ৪৬, ৪৭) রাজা দেবাশীষ রায় মহোদয়ের এই বক্তব্যে রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবিরের অবদানের প্রতি স্বতোঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে।

চাকমা সমাজে সদ্ধর্মের পুনর্জাগরনের মূলে শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবিরের মহান অবদানের জন্য চাকমাগণ তাঁর কাছে ঋনী একথা অকপটে স্বীকার করা হয়ে থাকে। লক্ষণীয়; - "সত্যকথা বলতে হলে ২০/২৫ বৎসর পূর্বে চাকমা সমাজে কঠিনচীবর দানের বিধি বিধান জানা ছিলনা। অন্যান্য ধর্মাচরণ বিধিও খুব যে জানাছিল তাও নয়। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির (তখন স্থবির) বার্মায় শিক্ষা সমাপন করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তখনকার চাকমা প্রধান স্বনামধন্য মেজর রাজা ত্রিদিব রায় সঙ্গে সঙ্গে তখন তাঁকে রাজগুরু পদে বরণ করে নেন। ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত সত্য যে, সর্ব্ব প্রথম তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই চাকমা সমাজে

ধর্মের জাগরণ আসে। শীল পালন, উপসথ গ্রহণ, চীবর দান, সংঘদান ইত্যাদি বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই প্রথম পাঠ নিই। তখনকার দিনে অবশ্য পূর্বে বর্ণিত তৃতীয় প্রণালী মতে পূর্বে প্রস্তুত চীবর দিয়েই কঠিন চীবর দান করা হত। কিন্তু সেই যুগে তাও কম ছিলনা। আর এভাবে তাঁর কাছে হাতেখড়ি না নিলে পরবর্তীকালে বনভন্তের মত মহাসাধককে বুঝার মত, গ্রহণ করার মত আমাদের সামর্থ হতনা। এযেন অনেকটা মহাসাধক মুক্ত পুরুষ বনভন্তের কল্যানময় আবির্ভাবের জন্যই আগে ভাগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখা। (দ্রষ্টব্যঃ "বুদ্ধ প্রশংসিত কঠিন চীবর দান ও আধুনিক বৌদ্ধ সমাজ, শ্রী বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান, প্রাক্তন সম্পাদক, রাজবনবিহার পরিচালনা কমিটি; বৃহতের সন্ধানে। শ্রীলঙ্কা সরকার কর্তৃক উপহার প্রদত্ত বোধি বৃক্ষ চারা রোপন ও শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ ভিক্ষু (বনভন্তে) মহাস্থবির ববনোৎসব '৮১ স্মরণিকা) প্রবন্ধের লেখক বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডি.সি. অফিসের হেডক্লার্ক ছিলেন। তিনি চাকমা উত্তরাধিকার আইন ও চাকমা প্রবাদবাক্য গ্রন্থের রচয়িতা এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

কালিন্দী রাণীর আমলে তঞ্চঙ্গ্যাগণ বৃটিশের কুকি দমন অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। রাইংখ্যং কুতুবদিয়ার অধিবাসী (তৎকালে সুবলং বরকলকের বাসীন্দা) শুভধন তঞ্চঙ্গ্যা, কুন্ড মহাজন, হিচাধন আমু বিভিন্নভাবে বৃটিশদের সহায়তা করেছিলেন বলে জানা যায়।

পাকিস্তান আমলেই তঞ্চঙ্গ্যাদের শিক্ষা দীক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়নে যাত্রা শুরু হয়। চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজকল প্রতিষ্ঠিত হলে এতদএলাকার তঞ্চঙ্গ্যাগণ অনেকেই চাকুরী এবং বাঁশ সরবরাহের ঠিকাদারী গ্রহণ করে। এই প্রথম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে তাদের ব্যাপক যোগাযোগ ঘটে। কাপ্তাইতে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ ১৯৬০ সালে সম্পন্ন হয়। জমিজমা, ঘরবাড়ী জলমগ্ন হলে রাইংখ্যং অঞ্চলের বহু তঞ্চঙ্গ্যা বান্দরবান, রেজা, আলীকদম, রোয়াংছড়ি, নোয়াপতং এলাকায় চলে যায়। ঐ প্রকল্পের অধীনে শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (তিনি তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সর্ব প্রথম বি.এ ডিগ্রীধারী) কানুনগো হিসেবে এবং শ্রী বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা এসিষ্ট্যান্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। পূর্বে জেলা প্রশাসক কার্য্যালয়ে শ্রী যোগেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ও শ্রী রবিকুমার তঞ্চঙ্গ্যা এম. এল. এস. এস. চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সুযোগ্য সন্তান শ্রী যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা ১৯৬৬ সালে এল. এল. বি ডিগ্রী অর্জন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর অপর কেহ

তৎপূর্বে ঐ ডিগ্রী লাভ করেছিলেন বলে জানা যায় না যদিও তৎকিয়ৎ পরবর্তীকালে চাকমা ও মারমাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক এল. এল. বি ও এল. এল. এম ডিগ্রী অর্জন করেছেন। শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা ১৯৬৯ সালে ই. পি. সি. এস পাশ করে ১৯৭০ সালে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ লাভ করেন এবং ১৯৯০ সালে মৌলভীবাজার জেলার জেলা প্রশাসক পদে ২রা জুলাই যোগদান করেন।

ষাট ও সত্তরের দশকের দিকে তঞ্চঙ্গ্যাদের অনেকেই সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে কয়জন তারা হলেন- শ্রী যোগেশচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (শিক্ষক), শ্রী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা, (আমিন) তিনি বর্তমানে রাঙ্গামাটি চারুকলা একাডেমীর অধ্যক্ষ। তদানীন্তন জেলা প্রশাসক জনাব শফিকুল ইসলাম মহোদয় (বর্তমানে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার) এই একাডেমী স্থাপন করে দেন। ১৯৮১ ইং ১লা জানুয়ারী বঙ্গভবনে যুব সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক শ্রী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা পার্বত্য চট্টগ্রামের সেরা শিল্পী (চারু) হিসেবে সম্বর্ধিত হন। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রী চিত্র কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডে) শ্রী নতুন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (শিক্ষক) শ্রী রজনী কান্ত তঞ্চঙ্গ্যা (ব্লক সুপার ভাইজার) শ্রী অজিত কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও শ্রী মতি শাসনা তঞ্চঙ্গ্যা (অফিস সহকারী, জেলা প্রশাসক অফিস) এবং শ্রী নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা (এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বর্ত্তমানে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী) শ্রী সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা (ফার্মাসিষ্ট) শ্রী মনোজ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (শিক্ষক) শ্রী মোহন লাল তঞ্চঙ্গ্যা (শিক্ষক) শ্রী রবি মোহন তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি পৌরসভা) শ্রী হীরালাল তঞ্চঙ্গ্যা (সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক), শ্রী রাবন তঞ্চঙ্গ্যা (ঐ), শ্রী বাল্মিকী তঞ্চঙ্গ্যা (ঐ), শ্রী নেত্র (লত্র) তঞ্চঙ্গ্য (ঐ), শ্রীমতি পুষ্প তালুকদার (ঐ), শ্রী ভুবন মোহন তঞ্চঙ্গ্যা (ঐ), শ্রী অতুল তঞ্চঙ্গ্যা (ফরেষ্টার), শ্রী যোগেশচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (ফার্মাসিষ্ট) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে বহু তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষ মহিলা সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন বা করছেন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়ন সত্তরের দশক হতে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। প্রকৌশল, চিকিৎসা প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষার্থী পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তঞ্চঙ্গ্যাদের অংশগ্রহণ উল্লেখ্যযোগ্য। ১৯৭১ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে যখন পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্যাতন আরম্ভ হয় তখন চট্টগ্রাম জেলার লোক, দলে দলে ভারতের মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ধাবিত হয়। রাজবিলা, নোয়াপতং, তারাছা (বান্দরবান), রাজস্থলী, রাইংখ্যং এর দুর্গম পার্বত্য

অঞ্চলে ও দুর্ভেদ্য জংগল অতিক্রম কালে তাদেরকে ঐ এলাকার তঞ্চঙ্গ্যাগণ আহার পানীয় দিয়ে সহায়তা করে এবং নিরাপদ পথে সীমান্ত পাড় করে দেয়। রাজস্থলীর ভাইস চেয়ারম্যান জ্ঞান বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, নূতন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (শিক্ষক) মুনু তঞ্চঙ্গ্যা, আরো অনেকে এব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। ঐসব এলাকাতে এবং হোয়াগ্গা, বারঘোনিয়া অঞ্চলে পাঠান পাঞ্জাবীদের হাত থেকে বহু বাংগালী পরিবারকে আশ্রয় প্রদান করা হয়। হোয়াগ্গার অধিবাসী বর্তমানে ১নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী অনিল তঞ্চঙ্গ্যা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মুক্তিযুদ্ধে কমান্ডারের দায়িত্বও পালন করেন। বান্দরবানের বালাঘাটা নিবাসী উদয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা ও লালমোহন তঞ্চঙ্গ্যা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। বান্দরবানে অদ্যাবধি তাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়।

তঞ্চঙ্গ্যাদের রাজনৈতিকভাবে পৃথক জাতিসত্ত্বা হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ হবার পরই স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ সনের ২১নং আইন পাশ ও বলবতের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য যথাক্রমে দুইটি ও একটি পৃথক পৃথক আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় তঞ্চঙ্গ্যাদের উল্লেখযোগ্য বসতি না থাকায় ঐ জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে তঞ্চঙ্গ্যাদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণ করা হয়নি। ১৯৮৯ সনের ২৫শে জুন প্রথম স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ নং হোয়াগ্গা মৌজার হেডম্যান বিশিষ্ট সমাজকর্মী শ্রী পরিমল তালুকদার এবং ১২২ নং কুতুবদিয়া মৌজার স্বনামধন্য মেঘনাদ কার্বারীর সুযোগ্য পুত্র শ্রীরূপময় তঞ্চঙ্গ্যা (বাবুল) রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। বান্দরবান জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে ১৩১ নং বল্লালছড়া মৌজার প্রাক্তন হেডম্যান শ্রী সাতকমল আমুর পুত্র বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী প্রসন্নকান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (দুর্জয়) সদস্য পদে নির্বাচিত হন।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রবর্তনে সরকারের সহায়তা করে শ্রী পরিমল তালুকদার উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম স্বাধীন নাগরিক হিসেবে তঞ্চঙ্গ্যাগণ স্বীকৃতি লাভ করে এবং প্রশাসন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে।

গোঝা ও গুষ্ঠিঃ

তঞ্চঙ্গ্যা কথায় গোঝাকে গছা ও গুষ্ঠিকে গুত্তি বলে। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সর্বমোট ১২টা গছা বা দল আছে। উক্ত ১২টা গছার মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টা গছার লোকেই বসবাস করছেন। অবশিষ্ট ৬টা গছা এককালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করলেও চাকমা রাজা ধরন বক্স খাঁর আমলে আবার আরাকানে চলে যান। তাঁদের মধ্যে একদল লোক উনিশ শতকের মধ্যভাগে আরাকান থেকে চলে আসে এবং ১২০ নং ছাত্রুছড়ি মৌজায় বসতি স্থাপন করে। তাদের কিন্তু গছার নাম নির্দিষ্ট ছিলনা -তাই তাদেরকে অন্যান্য বা অঞ্জ্য গছা বলে অভিহিত করা হয়।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এলাকায় বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের গছা ও গুষ্ঠির পরিচিতি দেওয়া হলঃ

গছা বা দল		**গুত্তি বা গুষ্ঠি**
১। মো গছা	ঃ	তাশি গুত্তি, কবাল্যা গুত্তি, আগারা গুত্তি, খুস্যা গুত্তি, দাল্লোরা গুত্তি, গুণ্যা গুত্তি ও করুগ গুত্তি।
২। কাররয়া গছা	ঃ	গজাল্যা গুত্তি, ফারাংশা গুত্তি, লাপোস্যা গুত্তি, আরারয়া গুত্তি, বকছাড়া গুত্তি, তাশি গুত্তি, বুং গুত্তি, বলা গুত্তি ও বাঙাল গুত্তি।
৩। ধন্যা গছা	ঃ	পশোয় গুত্তি, পন্ডিত গুত্তি, তাঞ্জাব গুত্তি, কালাথংজা গুত্তি, বন্ধ্যব গুত্তি, পিশো গুত্তি, রাঙেয়া গুত্তি, বলা গুত্তি ও বাঙ্গাল্যা গুত্তি।
৪। মংলা গছা	ঃ	পালংশা গুত্তি, দারণ্যা গুত্তি, নাবানা গুত্তি, দেবা গুত্তি ও কালেয়া গুত্তি।
৫। মেলং গছা	ঃ	আমেলা গুত্তি, আলু গুত্তি, তেমেলে গুত্তি ও পক্ত গুত্তি।
৬। লাং গছা	ঃ	বেদব গুত্তি, শক্কা গুত্তি, লাম্বায়া গুত্তি, পারা গুত্তি ও বলা গুত্তি।

অন্যান্য ৬ গছার গুত্তির বিবরণ পাওয়া যায়নি।

দ্রষ্টব্যঃ তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতিঃ যোগেশচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, প্রথম সংস্করণ; ১৯৮৫ ইং।

ভাষাঃ

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার মূল উৎস হচ্ছে পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ইত্যাদি আর্যভাষা। এই সকল ভাষা থেকে বহুশব্দ বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। বাংলা ভাষার সংগে ঘনিষ্ঠ হবার কারণ, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও পালি প্রাকৃত ও সাংস্কৃতি থেকে হয়েছে। চাকমা ভাষার সংগে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার ঘনিষ্ঠতা সমধিক। সাম্প্রতিককালে ভৌগলিক, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষা, মামলা মোর্কদমা ইত্যাদি বিবিধকারণে বহু বাংলা শব্দ অবিকৃত অবস্থায় কিংবা আংশিক পরিবর্তিত হয়ে সরাসরি তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় প্রবেশ করছে এবং এই প্রবেশের ধারা অব্যাহত রয়েছে; সম্ভবতঃ তা ভবিষ্যতেও থাকবে।

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় যতগুলি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে ঐ শব্দ সমূহের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই আর্যভাষা থেকে উদ্ভুত হয়েছে। আর্য ভাষা ব্যতীত বহু অন-আর্য (অনার্য) এবং ভোটবর্মী শব্দও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তবে এদের সংখ্যা খুবই কম।

ব্যুৎপত্তির দিক থেকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার শব্দগুলি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ (১) আর্য (২) অনার্য, ও (৩) বিদেশী শব্দ যথা- আরবী, ফার্সি ও ইংরেজী আরাকানী বা বর্মী ও অহমিয়া ভাষা।

আর্য ভাষার শব্দ ঃ

তঞ্চঙ্গ্যা	বঙ্গার্থ	মূল	
মানাই/মানেই	মানুষ	সংস্কৃত	মনু
মেলা	স্ত্রী লোক	,,	মহিলা
করা/কধা	কথা	,,	কথা
উচু/উজু	সোজা	পালি	উজু
চিত্	চিত্ত	,,	চিত্তং

অনার্য ভাষার শব্দ :

১) **জুমঃ-** জুম (পাহাড়ের চূড়া কিংবা ঢালু অংশে উপজাতীয় লোকেরা যে বিশেষ ধরনের এক প্রকার চাষ করে তাকে জুমচাষ বলা হয়। এবং যে স্থানে জুম চাষ করা হয় ঐ স্থানের নামই জুম।

অনার্য শব্দ	বঙ্গার্থ
তাগল	(একপ্রকার দা)
কালাং/কাল্লং	(বেতের তৈরী ঝুরি। ইহা দড়ি দিয়ে মাথায় বহন করা হয়।)
কুরুম/কুরুং	ঐ- একপ্রকার ছোট ঝুরি।
পুল্ল্যাং বা পিল্লাং	ঐ- এক প্রকার ঝুরি।
পুল্লাং	বোতল
কিচিং	দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্ন স্থান
তারেং/তাং বা তারাং কান্যান/কামা	সাধারণভাবে পাহাড়ের খাড়া অংশ
ক্যাং (আরাকানী শব্দ)	বৌদ্ধ মন্দির/বিহার
সোয়াইন/স্যং (আরাকানী শব্দ)	ভিক্ষুদের আহার্য্য দ্রব্য
মংচাং/মৈসাং (আরাকানী শব্দ)	শ্রামণ
খবং	পাগড়ী
কাঁ/কাহ্	একজাতীয় বাটী
পোই	আহারের পাত্র/সাধারণত আহার করার উপাদান যেমন কলাপাতার পৈ, থালাবাসন ইত্যাদি।
ধহ্	চাউল মাপার জন্য বাঁশের তৈরী একমুখ খোলা বাঁশের টুকরা।
খিংকরং/খংগং/খেংগ্রং	(এক টুকরা বাঁশের ছোট ফালী দিয়ে ছোট দুই ডালা বিশিষ্ট একধরনের বাদ্য যন্ত্র। পিছনে সুতা বেঁধে সুতায় টান দিয়ে যন্ত্রটি ঠোঁটে লাগিয়ে বাজান হয়।
ধুরুক/ধুদুক	এক টুকরা বাঁশের মাঝখানে ফাঁকা করে তৈরী একধরনের বাদ্য যন্ত্র।

লক্ষনীয় যেঃ- তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষায় বিভিন্ন গোঝার মধ্যে উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন বাংলা "কোথায়" শব্দটি মুঅ গোঝার ও ধন্যা গোঝার লোকেরা বলে কুরি/করু, কাররোয়া গোঝার লোকেরা বলে কুধি। মেলংছা, লাম ও মংগলা গোঝার লোকেরা বলে কুরু। অনেক সময় শব্দের শেষে 'র' থাকলে কারবোয়া গোঝার লোক ব্যতীত অন্যান্য গোঝার লোকেরা "অ" উচ্চারণ করে। যেমনঃ-

বাংলা	কাররোয়া গোঝা	অন্যান্য গোঝা
আমি পারি না	মুই ন পারং	মুই ন পাঅং

বিদেশী শব্দ	**বঙ্গার্থ**	
অক্থ	সময়	আরবী ওয়াক্ত
গরবা	অতিথি	আরবী গোরবা
মুক্যা	ভুট্টা	ফার্সি
অভিচ্	অফিস	ইংরাজী Office
স্কুল	বিদ্যালয়	ঐ School

পালি ও সংস্কৃতি কর্তার বচন অনুসারে ক্রিয়া পদের একাধিক বচন হয়, তদ্রূপ তঞ্চঙ্গ্যা ভাষাতেও ক্রিয়াপদের একাধিক বচন হয়ে থাকে। উদাহরণঃ-

বচন	তঞ্চঙ্গ্যা	পালি	বঙ্গার্থ
একবচন	মুই শহরত্ যেইন/যাইন	অহং নগরং গচ্ছিস্সামি	আমি শহরে যাইব
বহুবচন	আমি শহরত যেবং/যাবং	ময়ং নগরং গচ্ছিস্সাম	আমরা শহরে যাব।

বস্ত্র বয়নরত তঞ্চঙ্গ্যা তরুণী।

নৃত্যরতা তঞ্চঙ্গ্যা কিশোরী।

পোষাক পরিচ্ছদ ও অলংকারঃ

তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব পোষাক ও অলংকার আছে। বিশেষতঃ মহিলাদের পোষাকে বৈচিত্র্য রয়েছে। চাকমা মহিলা কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতীয় মহিলাদের মধ্য থেকে স্বকীয় পোষাকে আচ্ছাদিত তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাকে অতি সহজেই পৃথক করা যায়। কারুকাজ করা চুলের কাঁটা ও চেইন সজ্জিত খোঁপাকে চেষ্টনী দিয়ে মাথায় খবং বাঁধা তঞ্চঙ্গ্যা মহিলার গায়ে থাকে ফুলহাটা কোবোই। এই কোবোই এর কাঁধে এবং হাতের প্রান্তে নানা রঙের সুতায় ফুলবোনা থাকে। পরনে থাকে সাতরঙা পিনুইন বা পিনন। পিননের দুই প্রান্তে লম্বালম্বি কালো রঙের স্ট্রাইপ, মাঝখানে দুইপ্রান্তে লাল রঙের লম্বালম্বি স্ট্রাইপ এবং সর্বমধ্যে বিভিন্ন রং মিশ্রিত সুতার স্ট্রাইপ। তবে সাতরঙের মধ্যে সাদা রং কম ব্যবহৃত হয়। এই কারুকাজ করা পিননকে একটি কারুকাজ করা সাদা কোমর বন্ধনী দিয়ে পরিধান করে। সাদা কোবোই এবং খবং কারবোয়া গোঝার মহিলারা ব্যবহার করেন। অন্যান্য গোঝার মহিলারা কালো কোবেই ব্যবহার করেন। অধুনা কোবোই এর পরিবর্তে ব্লাউজই অত্যধিক ব্যবহৃত হচ্ছে।

পূর্বে তঞ্চঙ্গ্যা মহিলারা যে অলংকার ব্যবহার করত সেগুলো হচ্ছে কানে রাজজুর ও ঝংগা, কব্জিতে বাঘোর, কুচিখারু, বাহুতে তাজজুর, গলায় চন্দ্রহার, হাঁচুলি, সিকিছড়া যার যা পছন্দ। এইসব অলংকার সাধারণতঃ রূপায় তৈরী এবং বৈশিষ্ট পূর্ণ। ইদানীং রূপার পরিবর্তে স্বর্ণালংকার ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন- গলায় চেইন বা লকেট ঝুলানো চেইন, কানে দুল বা ইয়ারিং, কব্জিতে রুলি বা চুড়ি ইত্যাদি।

তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষের পোষাক ধুতি ও লম্বাহাতা জামা। তবে আর্থিক অবস্থানুযায়ী ও শিক্ষাগত মানদন্ড অনুসারে পুরুষদের পোষাকে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অধুনা প্যান্ট সার্ট, কোর্ট প্যান্ট অনেকেই পরিধান করছেন। সাধারণের মধ্যে লুঙ্গি ও জামা পরিধান করতে দেখা যায়। তঞ্চঙ্গ্যা মহিলারা শাড়ী ব্লাউজ ও মেক্সী প্রভৃতি আধুনিক পোষাক পরিধান করতে আরম্ভ করেছে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কে কোন বিষয়ে সর্বপ্রথমঃ

১। প্রথম ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা ও প্রকাশকঃ কবিরাজ পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা।

২। প্রথম বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেনঃ শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, তিনি জেলা কানুনগো ছিলেন।

৩। প্রথম ই. পি. সি. এস ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটঃ শ্রী যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা, তিনি জেলা প্রশাসকও হন।

৪। প্রথম এল. এল. বিঃ শ্রী যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এল. এল. বি ডিগ্রী অর্জন করেন।

৫। প্রথম এল. এল. এমঃ শ্রী দীন নাথ তঞ্চঙ্গ্যা।

৬। প্রথম এম. এ ডিগ্রী লাভ করেনঃ শ্রী জ্ঞান রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা।

৭। প্রথম এম. এস. এসঃ শ্রী মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা।

৮। প্রথম মহিলা এম. এ ডিগ্রী লাভ করেনঃ স্নিগ্ধা তঞ্চঙ্গ্যা।

৯। প্রথম মহিলা বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেনঃ শোভারাণী তালুকদার।

১০। প্রথম বি. এস. সি. ডিগ্রী লাভ করেনঃ শ্রী সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা।

১১। প্রথম মহিলা বি. এস. সি. ডিগ্রী লাভ করেনঃ জ্যোছ্না তঞ্চঙ্গ্যা।

১২। প্রথম পলিটেকনিক পাশ করেনঃ শ্রী নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা।

১৩। প্রথম বি. এস. সি ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেনঃ শ্রী দীপ্তিময় তঞ্চঙ্গ্যা।

১৪। প্রথম এম. বি. বি. এস. পাশ করেনঃ মিতালী তালুকদার।

১৫। প্রথম সিনিয়র নার্স এবং মেট্রনঃ রেনু তালুকদার। তিনি চন্দ্রঘোনা মিশন সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষা।

১৬। প্রথম সদস্য- স্থানীয় সরকার পরিষদ ঃ

১) শ্রী পরিমল তালুকদার, রাঙ্গামাটি

২) শ্রী রূপময় তঞ্চঙ্গ্যা (বাবুল), রাঙ্গামাটি

৩) শ্রী প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, বান্দরবান।

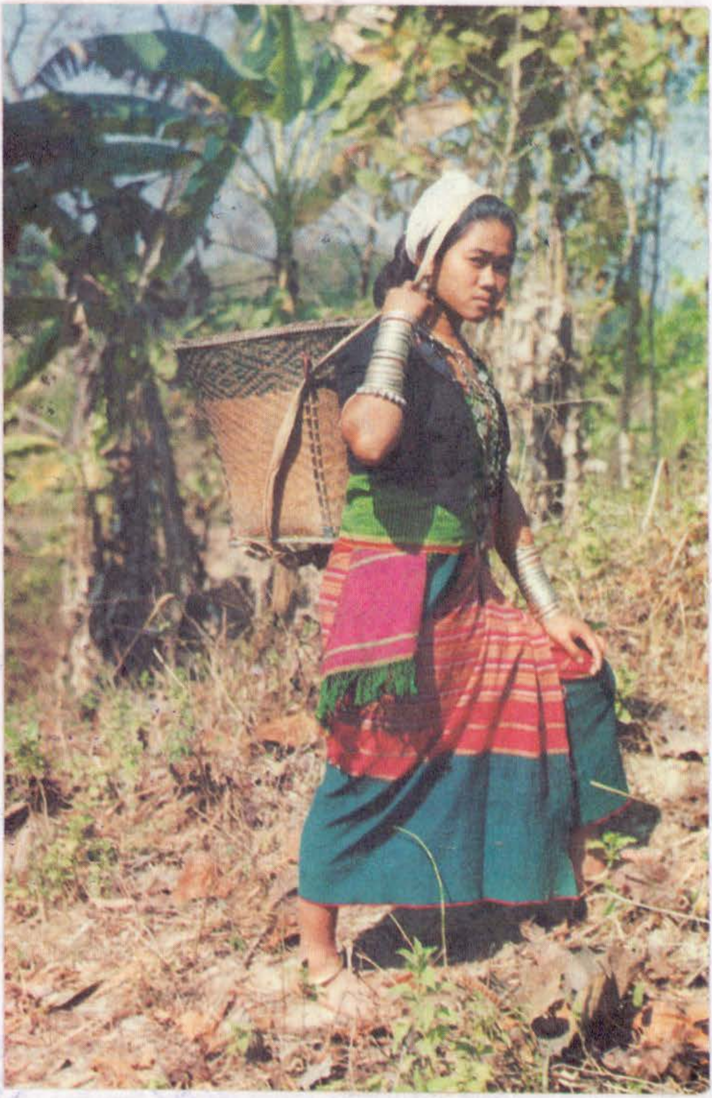

গৃহ মুখী তঞ্চঙ্গ্যা রমণী।

১৭। বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রথম সরকারীঃ বৃত্তিধারী- (প্রকৌশল)ঃ (১) শ্রী অনুপম তঞ্চঙ্গ্যা, (২) জয়া তঞ্চঙ্গ্যা ও (সাধারণ)ঃ উৎপল তঞ্চঙ্গ্যা।

১৮। বিদেশের (কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত, থাইল্যান্ড পত্রিকায় প্রথম প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটিকা প্রকাশিত হয়ঃ শ্রী বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যার প্রবন্ধ কবিতা ও নাটিকা। ১৯৭৭ ইং নভেম্বর, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে "উপজাতীয় সংস্কৃতিঃ তঞ্চঙ্গ্যা" শীর্ষক তাঁর বেতার কথিকা প্রচার করা হয়।

১৯। প্রথম পুরুষ ক্যাডেটঃ (১) দীপঙ্কর তঞ্চঙ্গ্যা '৯০ ইং ও (২) রিপন তঞ্চঙ্গ্যা '৯০ ইং।

প্রথম মহিলা ক্যাডেটঃ (১) রুমি তঞ্চঙ্গ্যা '৯২ ইং।

২০। প্রথম বি. এড. পাশ করেনঃ (১) জ্ঞানরঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা, (২) বিধু ভূষণ তঞ্চঙ্গ্যা, (৩) সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা ও (৪) বীথি তঞ্চঙ্গ্যা।

২১। প্রথম বি. কম. (অনার্স) এম. কম. ঃ রাজেন্দ্র তালুকদার

২২। চারুশিল্পে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেনঃ শ্রী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা, অধক্ষ্য, রাঙ্গামাটি চারুকলা একাডেমী।

২৩। প্রথম পৌরসভার কমিশনার (বান্দরবান)ঃ শ্রী নির্মলকান্তি তঞ্চঙ্গ্যা

২৪। রাজনৈতিক ধ্যান ধারণায় বিশিষ্ট চিন্তার অধিকারী বলে [redacted] বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা ও শ্রী সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা।

প্রথম টিভি ও বেতার শিল্পীঃ

১। শ্রী দীন নাথ তঞ্চঙ্গ্যা (টি. ভি. ও বেতার)

২। শ্রীমতী সুনীলা তঞ্চঙ্গ্যা (বেতার)

শ্রী কার্তিকচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা কবিরত্ন, তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সর্বাধিক [redacted] রচনা ও প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সালে "বৌদ্ধ গৃহীবিনয়" নামে সর্বপ্রথম তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "উদয়নবস্তু" "বৌদ্ধ গল্পমালা" "মহাবোধি পালাঙ্ক কথা" তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ছাড়াও তিনি "মানুষ দেবতা" "অনাগত বংশ", "দানফল কথা", শ্রী বুদ্ধের বারমাস স্মৃতি, অক্ষর গাথা, বিজয় গিরি নাটক প্রভৃতি রচনা করেন।

জয়চন্দ্র গেংগুলিঃ তিনি একজন কিংবদন্তীর পুরুষ হিসেবে গণ্য। চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় ও নলিনাক্ষ রায়ের আমলে তিনি রাজগেংগুলি ছিলেন। তিনি অন্ধ বলে "কানা গেংগুলি" হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির ও

অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে কতিপয় অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচলিত আছে। প্রাচীন ঐতিহ্য মন্ডিত ধনপুদি রাধামন পালা, চাদিগাং ছাড়া পালা তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যেন চাকমা জাতির অতীতের শৌর্য বীর্য্যের ইতিহাস সামনে এসে হাজির হত।

গেংগুলিরা সাধারণতঃ অতীত ঐতিহ্যের উপর রচিত ধনপুদি রাধামন পালা, চাদিগাংছাড়া পালা, শিবচরনের গোজেন লামা, লাঙ্যা লাঙনি পালা, বিভিন্ন বারমাসী গেয়ে থাকে। একটি মাত্র বেহালার সহায়তায় গেংগুলিরা রাতদিন বিরতিহীন গান গেয়ে থাকে। চাকমাদের মধ্যে ও গেংগুলি আছে। বলা বাহুল্য চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা গেংগুলিরা মূলতঃ একই পালা বা বারমাসী গেয়ে থাকে। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে বংশী গেংগুলি, পচান গেংগুলি রুসিঅং গেংগুলি, সাশি অং গেংগুলি, দুম্বুরু গেংগুলি, ভগিরথ গেংগুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে গেংগুলি ছাড়া কতিপয় নাম করা তান্ত্রিক বা বৈদ্যের নাম উল্লেখ করার মত। তারা স্বজাতীয় তঞ্চঙ্গ্যাদের ছাড়া অন্য সমাজের লোকদের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ও বিখ্যাত। তন্মধ্যে নংপ বৈদ্য, তিতাকাজী বৈদ্য, শরৎ বৈদ্য প্রভৃতি খুবই বিখ্যাত ছিলেন। তারা মারন, উচাটন, বশীকরণ ও সম্মোহনী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন জটিল রোগ নিরাময় ছাড়াও নারী পুরুষের বিশেষতঃ স্বামীস্ত্রীর বিভিন্ন সমস্যা বনজ ঔষধ ও অস্ত্র মন্ত্র বলে সমাধানে তারা পারদর্শী ছিলেন। প্রয়াত শরৎ বৈদ্যের দৌহিত্র শ্রী মিলন তঞ্চঙ্গ্যা (বৈদ্য) ও এ বিষয়ে একজন দক্ষ চিকিৎসক।

অন্যান্য বিখ্যাত বৈদ্যদের নামও উল্লেখযোগ্য। যেমন কালাচান তঞ্চঙ্গ্যা, সিংহনাথ তঞ্চঙ্গ্যা, রাঙ্যা তঞ্চঙ্গ্যা, মহেন্দ্রলাল তঞ্চঙ্গ্যা ও লাল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা। লাল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা সম্মোহনী বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য তালিক শাস্ত্র ও তন্ত্রমন্ত্রের পান্ডুলিপি এবং বারমাসী, বিজগ প্রভৃতি যোগার করে দেন।

বর্তমানে স্নাতকোত্তর ও টেকনিক্যাল শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র–ছাত্রীদের তালিকা ঃ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজঃ

১। নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৫ম বর্ষ এম. বি. বি. এস)

২। দীপালী তঞ্চঙ্গ্যা (২য় বর্ষ এম. বি. বি. এস)

৩। সুবর্ণা তঞ্চঙ্গ্যা (১ম বর্ষ এম. বি. বি. এস)

৪। জিনাংশু তঞ্চঙ্গ্যা (২য় বর্ষ এম. বি. বি. এস)

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজঃ

১। স্বপন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৫ম বর্ষ এম. বি. বি. এস)

২। শিউলী তঞ্চঙ্গ্যা (২য় বর্ষ এম. বি. বি. এস) (উখিয়া)

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিঃ

১। সুলেখা তঞ্চঙ্গ্যা (সাধারণ ইতিহাস) শেষ বর্ষ, এম. এ.

২। অমিতা তঞ্চঙ্গ্যা (সাধারণ ইতিহাস) শেষ বর্ষ এম. এ.

৩। মনোরঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা (সমাজ বিজ্ঞান) শেষ বর্ষ এম. এস. এস.

৪। কৃত রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা (সমাজ বিজ্ঞান) শেষ বর্ষ এম. এস. এস.

রাজশাহী বি. আই. টিঃ

১। মুকুল তালুকদার (তঞ্চঙ্গ্যা) (শেষ বর্ষ) মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং।

২। জটিল তঞ্চঙ্গ্যা (প্রথম বর্ষ) মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং।

ঢাকা কৃষি মহাবিদ্যালয়ঃ

১। ধনেশ্বর তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যাদের উচ্চ শিক্ষার খতিয়ান/তালিকাঃ

রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

১। মিঃ ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

২। মিস্ বীথি তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ. বি. এড.

৩। মিসেস স্নিগ্ধা তঞ্চঙ্গ্যা, এম. এ.

৪। মিস্ সুলেখা তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ; এম. এ. পরীক্ষার্থী।

৫। মিস্ অমিতা তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ; এম. এ. পরীক্ষার্থী।

৬। মিঃ উৎপল তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৭। মিঃ রতন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

ঘাগড়া, কাউখালী থানা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

৮। মিঃ বিধু ভূষণ তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ; বি. এড

৯। মিঃ বিশ্বজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

১০। মিঃ দীপন তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এস. সি.

কাপ্তাই থানা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

১১। মিঃ জ্ঞান রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ. (অনার্স); এম. এ; বি. এড.

১২। মিসেস শোভারাণী তালুকদার, বি. এ.

১৩। মিঃ রাজেন্দ্র লাল তালুকদার, বি. কম (অনার্স); এম. এ.

১৪। ডাঃ মিতালী তালুকদার, এম. বি. বি. এস.

১৫। মিঃ কৃত রঞ্জন তালুকদার, বি. এস. এস. (অনার্স); এম. এস. এস. (পরীক্ষার্থী)

১৬। মিঃ ক্ষেমা রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

১৭। মিঃ প্রভাত চন্দ্র তালুকদার, বি. এ.

১৮। মিঃ অরুন চন্দ্র তালুকদার, বি. এ.

১৯। মিঃ নির্মল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

২০। মিঃ আদোই রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

২১। মিঃ দয়ারাম তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

২২। মিঃ সুনিল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

২৩। মিঃ চিত্ত রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

২৪। মিঃ নিবারণ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

২৫। মিঃ মনোরঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ. (বারঘোনিয়া)

২৬। মিঃ অমল বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

২৭। মিঃ মনোরঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

২৮। মিস্ জীতা তালুকদার, বি. এ.

২৯। মিসেস সুপ্তা তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৩০। মিস্ জ্যোছনা তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৩১। মিঃ হরিশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

বিলাইছড়ি থানা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

৩২। মিঃ মিলন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এস. এস (অনার্স) এম. এস. এস.

৩৩। মিস্ রেণু (রাঙাবী) তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৩৪। মিঃ কাজল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা বি. এ.

রাজস্থলী থানা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

৩৫। মিঃ যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা, বি. কম; এল. এল. বি; ই. পি. সি. এস, জন্মস্থানঃ কুতুবদিয়া, রাইংখ্যং।

৩৬। মিঃ সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এস. সি; বি. এড. জন্মস্থানঃ কুতুবদিয়া, রাইংখ্যং।

৩৭। মিঃ প্রদীপ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৩৮। মিঃ দীলিপ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৩৯। মিঃ উদয় শংকর তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৪০। মিঃ যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ (অনার্স); এম. এ.

৪১। মিসেস জ্যোছনা তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এস. সি.

৪২। মিঃ বিদ্যাকুমার তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৪৩। মিঃ দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা, এল. এল. বি (অনার্স); এল. এল. এম.

৪৪। মিসেস সুচন্দা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৪৫। মিঃ নন্দীয় তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৪৬। মিঃ বিল্প কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৪৭। মিসেস রূপশ্রী (রূপসা) তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৪৮। মিঃ অনুপম তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এস. সি, বি. ই.

রাঙ্গুনীয়া থানা, চট্টগ্রামঃ

৪৯। বিধান চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এস. সি.

বান্দরবান সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলাঃ

৫০। মিঃ অনন্ত কিশোর তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৫১। মিঃ বাবু লাল তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

৫২। মিঃ দীপ্তিময় তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এস. সি; বি. ই.

৫৩। মিঃ বোধি চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

উখিয়া থানা, কক্সবাজারঃ

৫৪। মিঃ মংচানু তঞ্চঙ্গ্যা, বি. এ.

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের নামের তালিকাঃ

১। মিঃ নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা (বর্তমানে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী)

২। মিঃ দুদু রাম তঞ্চঙ্গ্যা

৩। মিঃ কাঞ্চন তঞ্চঙ্গ্যা

৪। মিঃ সুদত্ত তঞ্চঙ্গ্যা

কৃষি ডিপ্লোমা ধারীদের নামের তালিকাঃ

১। মিঃ রজনীকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

২। মিঃ চিরমনি তঞ্চঙ্গ্যা

৩। মিঃ নন্দীয় তঞ্চঙ্গ্যা

৪। মিঃ দিব্যেন্দু তঞ্চঙ্গ্যা

৫। মি অমূল্যধন তঞ্চঙ্গ্যা

বিঃ দ্রঃ- এই গ্রন্থে কেবলমাত্র বাংলাদেশে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের বিবরণী প্রদান করা হয়েছে। ভাবীকালে অন্যান্য দেশে অবস্থানরত তঞ্চঙ্গ্যাদের বিবরণী প্রদান করার আকাঙ্খা থাকল।

সামাজিক অনুষ্ঠানঃ

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহ পদ্ধতিঃ

সমাজের মূল ভিত্তি হল বিবাহ। ইহা পরিবারের পূর্বশর্ত। পরিবার সমাজের স্তম্ভস্বরূপ। তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষ বিবাহযোগ্য হলে বিবাহের পূর্বে তাকে অবশ্যই ন্যূনপক্ষে তিনদিন শ্রমণ হয়ে শ্রামন্য ধর্ম পালন করতে হয়। সমাজে কতিপয় বিবাহ পদ্ধতি চালু রয়েছে। প্রয়াত শ্রী যোগেশচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাঁর "তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি" গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সাধারণতঃ ৩ প্রকারের বিবাহ পদ্ধতি রয়েছে।

১। কন্যার গৃহে বরকে নিয়ে বিবাহ

২। মনঃ মিলনে পলায়নের মাধ্যমে বিবাহ

৩। রাণী মেলার সাঙা অর্থাৎ বিধবা বিবাহ ইত্যাদি।

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বিধবা রমণীকে 'রাণী' এবং মেয়ে বা স্ত্রী লোককে বলা হয় 'মেলা'।

যদি কোন বিবাহিত পুরুষ অথবা বিধবা রমণী পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যায় তৎস্থলে অতি সাধারণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই বিবাহ কর্ম সম্পাদন করা হয়। উহাকেই বলা হয় রাণী 'মেলার সাঙা'। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বিবাহকে বলা হয় 'সাঙা'। বর্তমানে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রায় যুবক-যুবতীর বেলায় উক্ত সাঙার পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। এই সাঙার পদ্ধতি অতি সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। এতে বিবাহের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলেই নির্দিষ্ট সময়ে কনের গৃহে বিবাহ কর্ম সম্পাদিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা বিবাহ মন্ত্রের মাধ্যমে বিবাহ কর্ম সম্পাদন করা হয়।

মনমিলনে পলায়নের মাধ্যমে বিবাহ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। যেমনঃ কোন যুবক যুবতী, বিবাহের উদ্দেশ্যে রাতে কিম্বা দিনের বেলায় গোপনে কোথাও বা ছেলের গৃহে পালিয়ে যায়। উহাকে বলা হয় 'ধেযানা'। ধেযানা অর্থ পালিয়ে যাওয়া। পরের দিন ওদের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ মেয়ের বাবা মায়ের নিকট পৌছানো হয় এবং অন্য আর একদিন ছেলের বাবার অভাবে অভিভাবকরা মেয়ের বাবার গৃহে 'পৈ' গছাতে

যান। এখানে 'পৈ' অর্থ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত নাড়িভূঁড়ি বর্জিত একটা গোটা সেদ্ধ করা মোরগ ও দুই বোতল মদ উপঢৌকনকে বুঝায়।

বাবা-মা তাঁদের মেয়েকে বিবাহ দেবার ইচ্ছা থাকলে উক্ত পৈ গ্রহণ করেন। পলায়ণের মাধ্যমে যে বিবাহ হয় উহাকে বলা হয় "ছিনালী সাঙা''। "ছিনালী সাঙা" অর্থ দোষণীয় বিবাহ। উক্তরূপ বিবাহে ছেলেকে ১২ টাকা এবং মেয়েকে ৬ টাকা জরিমানা করা হয়। (বর্তমানে ছেলেকে ২৫ টাকা এবং মেয়েকে ১২ টাকা জরিমানা করা হয়)। বিবাহ হউক বা না হউক উক্ত জরিমানার টাকা অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। ইহা ব্যতীত পাড়ালীয়ার মান হিসাবে একটা মর্দা শুকর ছেলে ও মেয়েকে জরিমানা করা হয় এবং ওই শুকর বধ করে কোনও এক অবস্থাপন্ন বা পাড়ার কারবারীর গৃহে পাড়ালীয়ারা একত্রে মিলে রন্ধন করে খায়। কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত শুকরের পরিবর্তে ৫ টাকা জরিমানা করা হয় এবং বিচারকালে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যতজন পুরুষ উপস্থিত থাকে উক্ত টাকা তাদের মধ্যে সমান হারে বন্টন করে দেওয়া হয়। ইহাকে বলা হয় ছিনালী শুগর খানা"। শুকরকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বলা "শুগ" বা "শুগর"।

বিবাহ কর্ম সম্পাদিত হয় মেয়ের পিতৃগহে। বিবাহে কোনরূপ আড়ম্বরতা নেই। কেবল ছেলে ও মেয়ে উভয়ে মেয়ের বাবা মায়ের কাছে একটা "পৈ" গছিয়ে আশীর্বাদ নেয়। ইহাকে বলা হয় "সেপ মাগানা"। "সেপ্ মাগানা" অর্থ আশীবাদ চাওয়া। ছেলে ও মেয়ে পলায়নের পর মেয়ের বাবা ও মা ইচ্ছা করলে বিচারের দিন মেয়েকে ফেরৎ নিতে পারেন, উহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু পর পর যদি ছেলে ও মেয়ে একত্রে মিলে তিনবার পালিয়ে যায় তৎক্ষেত্রে শেষবারে মেয়ের বাবা মা তাদের মেয়ের উপর আর কোন দাবী করতে পারে না। বিচারের আগে ছেলে ও মেয়ে যতবার পালিয়ে যাক না কেন, উহাদের কেবল একবারই জরিমানা দিতে হয়। মেয়ের বাবা যত টাকা ইচ্ছা ছেলের নিকট দাবী করতে পারেন এবং ওই দাবী অবশ্যই পৈ গ্রহণের আগে করতে হয় নতুবা পরবর্তীকালে তাঁর কোন কিছু দাবী করার উপায় থাকে না। উক্ত দাবী করাকে বলা হয় "দা বা"। দাবা অর্থ দাবী। মেয়ের মাতা দুধালী টাকা হিসাবে ৭ টাকা পর্যন্ত দাবী করতে পারেন।

মনমিলনে পলায়নের মাধ্যমে বিবাহ আজকাল তঞ্চঙ্গ্যা মোগছাদের বেলায় অধিক প্রচলিত। এর কারণ আর্থিক অস্বচ্ছলতা, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে যতপ্রকার বিবাহ পদ্ধতি থাকুক, উহাদের মধ্যে একটি মাত্র সামাজিক প্রথাসিদ্ধ বিবাহ রীতি হলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ কর্ম সম্পাদন করা। ছেলের জন্য বৌ আনয়নের সময় হলে ছেলের বাবা কোন এক মনোনীতা মেয়ের বাবার কাছে খবর দেন যে, তিনি মেয়ের বাবার কাছে এক পিলাং মদ উপস্থাপন করতে চাহেন। মেয়ের বাবা মেয়েকে বিবাহ দেবার ইচ্ছা থাকলে উহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। অতঃপর ছেলের বাবা পর পর ৩ বার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মেয়ের বাবার গৃহে যাতায়াত করেন।

অতঃপর বিবাহের দিনে বরকে সাজিয়ে কনের গৃহে নেওয়া হয়। বরের পেছনে বরের ছোট বোন্ অথবা ঐ সম্পর্কের পাড়ালীয়া কোন কিশোরী অথবা যুবতী মেয়ে বরের মাথায় পাগড়ীর এক প্রান্ত হস্তে ধারণ করতঃ মাথায় 'ফো কালং' চাপিয়ে কনের গৃহে যাত্রা করে। (ফোকালং অর্থ কনের জন্য নতুন পোশাক ও গহনাপত্রাদি ভর্তি একটা শিল্প সম্মত বেতের ঠুরুং বিশেষ।)

যথাসময়ে বর পক্ষ কনের গৃহে পৌছলেও তাদেরকে সরাসরি গৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। বর পক্ষ পৌছার সঙ্গে সঙ্গে কনেকে গৃহের মধ্যবর্তী কোন এক কক্ষে কাপড়ের আড়ালে রাখা হয়। ইহাকে বলা হয় 'বৌ-লুগানা' অর্থাৎ বৌলুকানো। কনের সহিত আরও একজন যুবতী মেয়ে সম্ভবতঃ কনের বান্ধবী ও লুকানো অবস্থায় থাকে। মজার ব্যাপার, যতক্ষণ কনেকে বিবাহ বাসরে লুকানোর কাজ সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বর পক্ষকে গৃহ উঠানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কনে লুকানোর কাজ সমাপ্ত হলে কনে পক্ষের একজন খুব সম্ভব কনের বড় ভগ্নীপতি সম্পর্কের এসে বরের মাথার সামান্য উপর ভাগে শূন্যের উপর একটা মুরগীর ডিম বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে দিয়ে ডিমটা বরের পেছনের দিকে দুরে ছুঁরে ফেলে দেয় এবং বরের হস্তধারণ করতঃ যেখানে কনে লুকানো আছে তথায় বরকে নিয়ে বসিয়ে দেয়। ইহাকে বলা হয় 'জামাইতুলা'।

অতঃপর ফোকালং থেকে যাবতীয় পোশাক ও গহনা পত্রাদি বের করে একস্থানে সাজিয়ে রাখা হয় এবং কনের সহিত যে মেয়েটি লুকানো থাকে সে কাপড় উন্মোচন করতঃ কনেকে সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করে দেয়। বরকে এমন স্থানে বসানো হয় যাতে কাপড় উন্মোচন করা সত্ত্বেও সে কনেকে দেখতে না পায়। কনেকে বর পক্ষের আনীত বস্ত্র ও গহনাদি দ্বারা সজ্জিত করতঃ চুল আচড়িয়ে ভালোভাবে খোঁপা বেঁধে দিয়ে বরের বাম পাশে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়। বরকে যে ব্যক্তি উঠান থেকে

বিবাহ্ বাসরে আনয়ন করে এবং কনের সহিত যে মেয়েটি লুকানো থাকে ওদেরকে বলা হয় 'ছাবালা'। ছাবালা অর্থ ঘটক। উক্ত ছাবালাদ্বয় বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে থাকে।

প্রথমতঃ ছাবালাদ্বয় মিলে বর ও কনেকে পাশাপাশি করে একটা শ্বেতবস্ত্রখন্ড দ্বারা কোমড়ে বন্ধন করে দেয় এবং উপস্থিত গণমাণ্য লোকদের উদ্দেশ্যে বলে "ও বুড়াবুড়ী পাড়াল্যা গণমান্য লোক, অমুক অমুকীর লাক্তং বাণিদিস্ত্যে, তা-নে ফংগুই দিবার হুগুম্ আগেনে নাই? অর্থাৎ হে পাড়ার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গণ্যমান্য লোক সকল, অমুক অমুকীর বিবাহে জোড়া বেঁধে দিচ্ছি; এতে আপনাদের হুকুম অর্থাৎ সম্মতি আছে কি নাই?" (লাক্তং অর্থ বিবাহ্ এবং ফং অর্থ একত্র করা)।

উক্ত প্রকারে পর পর ৩ বার প্রশ্ন করা হয় কিন্তু কেবলমাত্র শেষের বারে একবার 'আগে' (আছে) বলে উত্তর দেওয়া হয়। এরপর পুরুষ ছাবালা বরকে এবং মেয়ে ছাবালা কনেকে জড়িয়ে ধরে ৭ বার বসা অবস্থাতেই উঠানো নামানো করে দেয়। একে বলা হয় 'নাচে দেনা'। এর অর্থ হলো বিবাহে সম্মতি প্রাপ্ত হওয়ায় বরকনের আনন্দে নৃত্য করা।

অতঃপর বর ও কনের ডান হাতে একত্রিত করে দিয়ে মঙ্গল ঘটের পানি সিঞ্চন করে দেওয়া হয়।

এইরূপে বিবাহ্ কর্ম সম্পন্ন হলে, বর ও কনেকে উপস্থিত বয়োবৃদ্ধদের নিকট নিয়ে গিয়ে একজন একজন করে প্রণাম করতে দেওয়া হয় এবং ঐ সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠরা পৈদাং থেকে তুলা ও তুন্ডুলসহযোগে বর কনের মাথায় খবঙে পাগড়ীতে গুজে দিয়ে আশীবাদ করেন। ইহাকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বলা হয় 'ছেপ্ দেনা' অর্থাৎ আশীবাদ দেওয়া। বিবাহের পর ৭ দিন যাবত বরকে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করার নিয়ম আছে। অতঃপর কনেকে নিয়ে বর নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহে বৈধ ও অবৈধঃ-

বৈধঃ সম্পর্কের বেলায় ঘটিষ্ঠ কিম্বা দূরের হোক মামাতো, পিস্তুতো, মেসতুতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ্ হতে পারে। বড় ভাই এর শ্যালীকা, বড়বোনের ননদ, বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার বিধবা অথবা তালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিবাহ্ করা চলে। শ্যালক কিম্বা সম্বন্ধীর বিধবা অথবা তালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিবাহ্ করা চলে। শ্যালীকা কিম্বা একই পরিবারভুক্ত না হলে পিতামহ অথবা মাতামহ সম্পর্কের নাত্নীর বিবাহ্ হতে পারে।

অবৈধঃ সহোদরাভগ্নী, বিমাতা, ভাগ্নী, ভাইঝি, মামী, পিসী, মাসী, চাচী, জেঠি ইত্যাদি সম্পর্কীয়া হলে বিবাহ করা চলেনা। সহোদর ভ্রাতাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে, একই পিতার ঔরসে ভিন্ন মাতার ছেলেমেয়েদের মধ্যে, একই মাতা কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরসজাত ছেলেমেয়েদের মধ্যে, স্ত্রীর বড় বোন অথবা স্ত্রীর বিমাতা, স্ত্রীর ভাইঝি ইত্যাদি বিবাহ করা চলে না।

কেহ অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ করলে জরিমানা ও সমাজ থেকে বহিস্কার উভয় শাস্তিই একত্রে করা হয়ে থাকে। যদি কেহ উপরোক্ত অবৈধ বিবাহ করে, জাতীয় বিচারে হেডম্যান সর্ব্বোচ্চ ২৫ টাকা ও রাজাবাহাদুর (চাকমা রাজা) ৫০ টাকা অপরাধীকে জরিমানা করতে পারেন। তদুপরি উপরোক্ত অবৈধ সম্পর্কের বিবাহিত নরনারী দু'জনকেই মাথার চুল খন্ড খন্ড করে ছেঁটে দিয়ে কোন এক বটবৃক্ষের গোড়ায় বহু ছিদ্র বিশিষ্ট কলসী দ্বারা ১০০ কলসী ৫০০ কলসী জল ঢালতে দেওয়া হয়। পুরুষ অপরাধীকে অতিরিক্ত শাস্তি স্বরূপ মুরগীর খাঁচা গলায় বেঁধে দিয়ে চেরা বাঁশের ঢেরা পিটিয়ে নিজের অপরাধের কথা বলে বলে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে দেওয়া হয়। অতঃপর পরিশুদ্ধিতার জন্য অপরাধী দু'জনকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে পবিত্র মঙ্গল সূত্রাদি শ্রবণ করতে হয়।

উপরোক্ত শাস্তিপ্রাপ্ত নারী কিম্বা পুরুষ উক্ত নির্দেশগুলো প্রতিপালন না করা পর্যন্ত তাদেরকে সমাজচ্যুত বলে গণ্য করা হয় এবং এই সময়ের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে সামাজিক ক্রিয়াকলাপাদি করা নিষিদ্ধ। ইহাকে বলা হয় "পাতের বার"।

বিবিধঃ

(১) কোন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি মনের মিল না হলে তৎক্ষেত্রে আপোষে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অর্থাৎ তালাক হতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে পাড়ার কারবারী কিম্বা মৌজার হেড্‌ম্যানের নিকট গিয়ে ছাড়াছাড়ি বা তালাকনামা সম্পাদন করে। ইহাকে বলা হয় "শুগ কাগচ্ দেনা"।

(২) যদি স্বামীর দোষে ছাড়াছাড়ি হয় তাহলে বিবাহের সময় পাওয়া বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ফেরত দিতে হয়না। স্বামী কোন প্রকার খরচাদিও পায়না। অধিকন্তু স্ত্রীর মানহানির জন্য স্বামীর অর্থ দন্ড দিতে হয়। ইহাকে বলা হয় "মানহানিতাঙা"।

(৩) স্ত্রীর দোষে যদি ছাড়াছাড়ি হয়, তাহলে স্ত্রীকে বিবাহের সময় দেওয়া যাবতীয় বস্ত্র ও গহনা পত্রগুলো স্বামী ফেরত পায়। এতদ্ব্যতীত বিবাহের সময় স্বামীর দেওয়া কন্যাপণ বা 'দাবা' ও বিবাহের খরচ সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিকভাবে তালাক প্রাপ্তাস্ত্রীর দিতে হয় এবং ঐ সাথে স্বামীকে মান হানির তাণ্ডাও দিতে হয়।

(৪) স্ত্রীকে অথবা উৎপীড়ন অযথা নিষ্ঠুরভাবে মারধর করলে সেই অত্যাচারীতা স্ত্রীকে স্বামীর স্ত্রীত্ব থেকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধে প্রথম বারের মত স্ত্রী ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে অপরাধী স্বামীর নিকট থেকে 'মুছ্‌লেকা' নিয়ে স্ত্রীকে স্বামীর হেফাজতে দেওয়া হতে পারে।

(৫) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীসহবাসে অক্ষম প্রমাণিত হলে, সমাজ ছাড়াছাড়ি হওয়ার ব্যাপারে কিছু করতে সমর্থ নহে। যদি স্ত্রী স্বামীকে উপরোক্ত অভিযোগে প্রমাণাদিসহ ছাড়াছাড়ি অর্থাৎ তালাক নামা দিতে চায় তৎক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া হয়।

(৬) বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা নারীর সহিত যদি অপর বিবাহিত কিম্বা অবিবাহিত পুরুষের গুপ্ত প্রনয় এবং দৈহিক মিলনের অপরাধ পমাণিত হয় তৎক্ষেত্রে তাদের উভয়কেই 'ছিনালী' অপরাধে দণ্ডিত করা হয়। এই দণ্ড আর্থিক এবং সামাজিক খানার জন্য নির্দিষ্ট মাপের একটা মর্দা শুকর আদায় করা হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বড় ছোট মাপের শুকর জরিমানা করা হয়। যেমন- "তিন মূট্যা" "পাঁচ মূট্যা" সাত মুট্যা শুকর" ইত্যাদি।

(৭) কারো বাড়ীতে বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করতে কেহ আনাগোনা শুরু করলে, উহার একটা চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন দ্বিতীয় পক্ষ ওই বাড়ীতে একই মেয়েকে বৌ দেখ্‌তে যাওয়া সামাজিক রীতিমতে নিষিদ্ধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ।

(৮) কোন পুরুষ বিবাহ করার সময় অন্ততঃ যেন- তেন প্রকারের একটা সামাজিক খানা না দিলে তার সামাজিক অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। সামাজিক খানা না দিয়ে বিবাহিত কোন লোকের মৃত্যু হলে তার মৃতদেহ কাঁধে বহন করে শ্মশানে নেওয়া নিষিদ্ধ। সামাজিক রীতিমতে তার মৃতদেহ অসম্মানজনকভাবে হাঁটুর নীচে রেখে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

(৯) ভাগ্নে-বৌ, পুত্র বধু, ছোটভাই-এর স্ত্রী এবং স্ত্রীর বড় বোনকে স্পর্শ করা সামাজিক রীতিমতে নিষিদ্ধ। এই অপরাধে অভিযুক্ত হলে অপরাধীর জরিমানা হতে পারে, এমনকি অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে তাকে 'পাতের বার' করা হয়ে থাকে।

(১০) বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেলে কন্যাকর্তা কোন কারণেই ওই পাত্রের সহিত মেয়ের বিবাহ্ দিতে অসম্মত কিম্বা অপারগ হলে বরকর্তার আপত্তি ক্রমে সামাজিক বিচারে তাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা এবং বৌ দেখ্তে যাওয়া আসার সম্পূর্ণ খরচ সহ্ মানহানির দন্ডে দন্ডিত করা হয়।

(১১) কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যদি অপর কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের নামে গুপ্ত প্রণয়ের অপবাদ দিয়ে থাকে, সামাজিক রীতিমতে তা প্রমাণ করতে অপারগ হলে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে এবং মানহানির জন্য তাকে জরিমানা করা হয়।

(১২) কুমারী কিম্বা বিধবা স্ত্রীলোকের অবৈধ গর্ভ সঞ্চার হলে, তাকে ব্যভিচার দোষে সামাজিক আদালতে (হেড্ম্যান কিম্বা কারবারীর গৃহে) অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। তখন সে তার অবৈধ গর্ভের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে সামাজিক আদালতে হাজির করে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারলে ছিনালী অপরাধে পুরুষটির সাজা হয়। কিন্তু প্রমাণ করতে না পারলে অবৈধ গর্ভবতীর একাকিনীই দন্ড এবং পাড়ালিয়াকে মানহানির [illegible] দিতে হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথাঃ

তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা চাকমাদেরই মত। যেমনঃ-

(১) পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সন্তানেরাই উত্তরাধিকার সূত্রে সমান অংশে সম্পত্তির মালিক হয়। (এখানে সম্পত্তি বলতে জমিজমা, গৃহের আসবাবপত্র, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে বুঝানো হচ্ছে।) কন্যা সন্তানেরা পৈতৃক সম্পত্তির মালিকানা দাবী করতে পারে না, তবে পিতার যদি কোন পুত্র সন্তান না থাকে কেবল তৎক্ষেত্রেই কন্য সন্তানেরা পৈতৃক সম্পত্তির মালিকানা দাবী করতে পারে।

(২) মৃত ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকলে উহাদের পুত্র সন্তানেরা সমান অংশে সম্পত্তি পেয়ে থাকে।

(৩) উন্মাদ অথবা সংসার ত্যাগী অথবা পিতার জীবিতাবস্থায় পৃথকান্নভুক্ত সন্তানেরা পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির সমান অংশ পায়।

(৪) মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত কোন পুত্র বা কন্যা সন্তান না থাকলে যদি তার পালিত পুত্র থাকে; তৎক্ষেত্রে সেই পালিত পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত

হয়। কিন্তু তাকে অবশ্যই মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর ভরণ পোষণ করতে হয়; অন্যথায় মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী সম্পত্তির একাংশ পায়।

(৫) পিতার মৃত্যুর পূর্বে যদি কোন পুত্রের মৃত্যু হয় এবং সেই পুত্রের ঔরস জাত পুত্র সন্তানাদি থাকে তৎক্ষেত্রে পিতামহের মৃত্যুর পর দৌহিত্র সূত্রে তারা সম্পত্তির অংশ পায়।

(৬) কোন স্ত্রীলোক যদি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তালাক প্রাপ্ত হয় এবং সেই গর্ভে যদি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, তবে সেই সন্তান পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে।

(৭) যদি কোন বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের পুত্র সন্তান থাকে এবং সে অবস্থায় যদি সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে, সেই পুত্র সন্তানেরা তাদের মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর তত্ত্বাবধানে থাকলেও উহারা মায়ের পূর্ব স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

(৮) অবৈধ সন্তানেরা সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে না। তবে তারা যে ব্যক্তির ঔরসজাত সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর উহার সম্পত্তির অংশ পেতে পারে।

(৯) যদি কোন ব্যক্তি অবিবাহিত অবস্থায় অথবা বিবাহ করেও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তৎক্ষেত্রে তার প্রাপ্য অংশ তার জীবিত সহোদর ভ্রাতাগণ সমান অংশে বন্টন করে নিতে পারে।

(১০) যদি কোন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তাঁর সম্পত্তির কোন অংশ অন্য কাহাকেও দানপত্র করে দিয়ে যায় তৎক্ষেত্রে দাতার মৃত্যুর আগে বা পরে দান গ্রহিতা ব্যক্তি সম্পত্তির মালিক হতে পারে।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে শবদাহ বা অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া পদ্ধতিঃ

কোন লোকের মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত ব্যক্তির মুখের ভিতর একটা রৌপ্য মুদ্রা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ওই টাকাকে 'মুঅতাঙা' অর্থাৎ মুখের টাকা বলা হয়। উক্ত টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তির আত্মা পরপারে অর্থাৎ ভবনদীর অপর পারে পারি দেওয়ার খরচ সঙ্গে দেওয়া। অতঃপর শবকে স্নান করানো হয় এবং নুতন শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়ে বাঁশ দ্বারা তৈরী পর্যঙ্কের (তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় আলৎ) উপর নতুন শ্বেতবস্ত্র খন্ড আপাদ মস্তক ঢেকে শয়নাবস্থায় রাখা হয়। আত্মীয় ও হিতৈষী লোকেরা

শবের বুকের উপর টাকা পয়সা যার যেমন ইচ্ছা রেখে দিয়ে যায়। ওই টাকা পয়সাকে বলা হয় "বুগতাঙা" অর্থাৎ বুকের টাকা।

সাধারণতঃ শবকে গৃহ বারান্ডায় ওইভাবে এক বা একাধিক রাত্রি পর্যন্ত রাখা হয়। বুধবার কিম্বা অমাবশ্যার দিন শবকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া রীতি বিরুদ্ধ। যে দিন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন সকালে বাড়ীর উঠানে কাঠের কফিন্ প্রস্তুত করতঃ শবকে উহাতে স্থাপন করা হয় এবং শবের জন্য ভাত সিদ্ধ করতঃ শবের মুখে কিঞ্চিৎ গুঁজে দিয়ে অবশিষ্টাংশ কলাপাতা দিয়ে 'মোচা' বেঁধে সঙ্গে দেওয়া হয়। এর অর্থ হলোঃ- কোন লোক দীর্ঘ দিনের জন্য দূরে যেতে হলে যেমন বাড়ীতে ভাত খেয়ে আর একটা ভাতের মোচা সঙ্গে নিয়ে যায়; তদ্রুপ মৃত ব্যক্তিকেও দেওয়া হয়। শবকে গৃহ থেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই শ্মশানে শুকনা কাঠ দিয়ে চিতা প্রস্তুত করে রাখা হয়। চিতা-পুরুষের বেলায় ৫ স্তর এবং স্ত্রীলোকের বেলায় ৭ স্তর করা হয়। শবকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুরুষ হলে পূর্ব মুখী এবং স্ত্রীলোক হলে পশ্চিম মুখী করে চিতায় স্থাপন করা হয়। অতঃপর ভিক্ষুর নিকট শবযাত্রীরা পঞ্চশীল গ্রহণ ও মঙ্গল-সূত্রাদি শ্রবণ করতঃ মৃত ব্যক্তির আত্মার সংগতি কামনায় সাধ্যমত টাকা পয়সা ভিক্ষুকে দান করে এবং উহা উৎসর্গ করে দেয়। যথারীতি পূণ্য কর্মাদি করণান্তে প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র কিম্বা জনৈক আত্মীয় চিতাকে ৭ বার প্রদক্ষিণ করতঃ শবের মুখে অগ্নি স্থাপন করে এবং চিতায় অগ্নি সংযোগ করে দেয়। (কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শবকে দাহ না করে কবর দেওয়া হয়। দাহকার্য সমাপ্ত হলে শ্মশান হতে ফেরার সময় স্নান অথবা হাত পা মুখ ইত্যাদি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ্যাদি প্রক্ষালন করনান্তে শুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রবশে করতে হয়।

শবদাহের পরের দিন প্রাতেঃ শ্মশানে গিয়ে স্বগোত্রীয় একজনের দ্বারা শবের ভস্মাবিশিষ্টের অস্থির বিভিন্ন অংশ থেকে সামান্য গ্রহণ করতঃ একটা নতুন মাটির হাঁড়িতে প্রবিষ্ট করিয়ে নতুন শ্বেতবস্ত্র দ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে আত্মীয় লোকটি জলে ডুবন্ত অবস্থায় উক্ত মাটির হাঁড়িটা পেছনের দিকে মাথার উপর দিয়ে ফেলে দেয় এবং ডুবন্ত লোকটি ডান হাত পানির উপরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন ডুবন্ত লোকটির কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে সূতা দিয়ে বন্ধন করতঃ টান দিয়ে তুলে নেয়। তঞ্চঙ্গ্যাদের বিশ্বাস, উক্ত প্রকারে অস্থি নদীতে ফেলে দিলে ওই অস্থিসমূহের কোন অংশ এক সময় না হয় আর এক সময় ভেসে গিয়ে পবিত্র গঙ্গানদীতে ও বুদ্ধগয়ায় পতিত হবে এবং এতে মৃতব্যক্তির সংগতি হতে পারে।

অস্থি বিসর্জনের পূর্বে অবশ্য অস্থিগুলো নেওয়ার পর শ্মশানের উপরিভাগে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চারকোন্ ঘিরে ৭ নাল সাদা সূতা বেড়িয়ে দেওয়া হয় এবং উপরে চাঁদোয়া খাটিয়ে দেওয়া হয়। বেড়ার মাঝখানে একটা জলপূর্ণ কলসী সাদা কাপড় দ্বারা মুখ বাঁধা অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় এবং উহার সহিত বই, কলম, চিরুণী, আয়না, পাংখা, সুগন্ধি দ্রব্যাদিও রেখে দেওয়া হয়। অতঃপর ৪টি বাঁশের আগায় ৪ খানা লম্বা সাদা বস্ত্র খন্ড শ্মশানের ৪ কোণায় পুঁতে দেওয়া হয়। এ'গুলোকে বলা হয় "ট্যাঙোএ্র"।

শবদাহের ৬ দিন পর সাপ্তাহিক ক্রিয়া করে দেওয়া হয়। উহাকে বলা হয় "সাত্দিন্যা"। উহাতে যথারীতি ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ ও সমাজের বিভিন্নস্তরের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং গৃহীর সাধ্যমত বিবিধ ভোজ্য উপকরণাদি দ্বারা উপস্থিত সকলকে ভোজের তৃপ্তিদানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। ওই সময়ে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে টাকা পয়সা সহ বিবিধ গৃহ সামগ্রী ভিক্ষু সংঘকে দান করা হয় এবং দানের সময় সকলে উপবেশন করতঃ ধর্মদেশনাদি শ্রবণান্তর দানীয় বস্তুসমূহ উৎসর্গ করে দেওয়া হয়। অবস্থাপন্ন পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মৃত্যু হলে দাহ করার পূর্বে স্বাধীন রাজার অনুকরণে গাড়ী টানার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তবে উহার কোন বাধ্য বাধকতা নেই। বোধিসত্ত্বের পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত জাতকে স্বাধীন রাজা স্বশরীরে দেবলোকে গমন করেন বলে উল্লেখ আছে। দেবলোকে তিনি দিব্য রথে আরোহন করে যান- ইহার স্মরণে রথ টানা হয়।

সামাজিক ক্রিয়া কলাপ বা অনুষ্ঠানাদিঃ

তঞ্চঙ্গ্যারা ধর্মীয় দিক দিয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও সনাতন প্রথা মতে এদের অনেককে গাঙপূজা, ভূতপূজা, চুমুলাঙ পূজা, মিত্তিনী পূজা লক্ষ্মী পূজা, কে-পূজা, বুর পাড়া ইত্যাদি কাল্পনীক দেব দেবীর পূজাও করতে দেখা যায়। অবশ্য উপরোক্ত পূজাসমূহ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে করা হয় না। ওই গুলো কেবল কাল্পনীক দেবদেবীর সন্তুষ্টি বিধান কল্পে অনুষ্ঠিত হয় মাত্র। উক্ত পূজাসমূহ সম্পাদনার্থে সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে তাদেরকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বৈদ্য বা অসা (ওঝা) বলা হয়।

অসা দুই প্রকারের আছে। যথাঃ- মরদ (পুরুষ) আসা ও মেলা (মেয়ে) অসা। মেয়েদের মধ্যে যারা ধাতৃবিদ্যার কাজ করে তাদেরকে বলা হয় "অসা মেলা"।

পুরুষ অসাগণ নানারকম ঝাড় ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদিতে কাল্পনীক দেব দেবীর নামে মোরগ, মুরগী, শুকর, ছাগল, হাঁস, কবুতর ইত্যাদি গৃহ পালিত পশু পাখী বধ করে পূজা দিয়ে দেয়।

(১) গাঙ পূজাঃ ইহাকে গঙা (গঙ্গা) পূজাও বলা হয়ে থাকে। কোন লোক রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকলে এবং কোন প্রকার চিকিৎসা অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগে কার্যকরী ফল দেখা না গেলে তৎক্ষেত্রে বৈদ্য বা অসাগণ তান্ত্রীক পদ্ধতিতে গণনা করতঃ স্থির করে যে, উক্ত রোগীকে গঙায় পেয়েছে কিনা অর্থাৎ ওই রোগীর প্রতি গঙা দেবীর কুনজর পতিত হয়েছে কিনা। যদি পরীক্ষায় স্থির হয় যে; ওই লোকটির প্রতি গঙার কু-নজর পতিত হয়েছে তৎক্ষেত্রে বৈদ্য বা অসাগণ জলের ঘাটে গিয়ে তান্ত্রীক পদ্ধতিতে রোগীর নামে গঙা দেবীর উদ্দেশ্যে মোরগ, মুরগী, হাঁস, কবুতর, ছাগল ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটি বলি দিয়ে দেয়।

(২) ভূতপূজাঃ- সাধারণত; পাহাড়ীদের ধারণা ছিল যে, ভূত গাছে বাসা করে থাকে। কোন লোক অথবা গৃহ পালিত পশু হারাণো গেলে অথবা কোন লোকের মস্তিষ্ক বিকার জনিত কারণে আবোল–তাবোল বক্‌তে থাকলে মনে করা হয় যে, ঐ লোকটাকে ভূতে পেয়েছে। সুতরাং ভূতের সন্তুষ্টি সাধনকল্পে বৈদ্য বা অসাগণ যে কোন একটা বৃহৎ বৃক্ষগোড়ায় গিয়ে তান্ত্রীক পদ্ধতিতে ভূতের উদ্দেশ্যে মোরগ, শুকর ইত্যাদি বলি দিয়ে দেয়।

(৩) চুমুলাঙ পূজাঃ- এই পূজা গৃহস্থের পারিবারিক মঙ্গলের জন্য অথবা গ্রহদোষ নিবারণার্থে করা হয়ে থাকে। ইহা বিবাহ রূপ সামাজিক বন্ধনের পরিশুদ্ধিতার উদ্দেশ্যে ও অতি করণীয় বলে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে স্বীকৃত। অন্যথায় বিবাহ অসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিবাহের পর চুমুলাঙ পূজা না করলে বিবাহিতা স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন অধিকার থাকে না বলেও বলা হয়ে থাকে। এই পূজায় মোরগ, মুরগী, শুকর ইত্যাদি বলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং তৎসঙ্গে মদ অবশ্যই থাকতে হবে। এই মদ যেখান থেকে হোক যোগাড় করে আনলে হবে না। এই মদ যে উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয় সে উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এই মদকে অতিশয় পবিত্র বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ চুমুলাঙ পূজাকে গৃহ দেবতার পূজা বলে গণ্য করা হয়।

(৪) মিত্তিনি পূজাঃ- তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় মিত্তিনী অর্থ মৃত্তিকা বা ধরণীকে বুঝায়। এই পূজা বিশেষতঃ নবান্নের সময় ঘটা করে সম্পাদিত হয়। ইহাতে গৃহস্থের মৃত

পূর্বপুরুষগণকে স্মরণ করে পিন্ডদান করা হয়। উদ্দেশ্য তাদের আত্মার শান্তি কামনা করা যাতে তাদের সন্তুষ্টিতে গৃহস্থের সার্বিক মঙ্গল সাধন হয় এবং প্রতিবছর জুমের ও জমির ফসলাদি অধিক হয়ে গৃহস্থের সুখ ও সমৃদ্ধি হয়।

(৫) লক্ষী পূজাঃ- আদিমকালে প্রায় তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবারে গৃহকত্রিরা মুরগীর সিদ্ধ ডিম অথবা আগে ডিম দেয়নি এমন বয়সের মুরগী (মোরগ নহে) বধ করে নাড়িভূঁরি ফেলে দিয়ে গোটা সিদ্ধ করতঃ পৈদাঙে সাজিয়ে গৃহের মধ্যবর্তী কোন এক কোণায় পূজা দিয়ে থাকে। লক্ষীদেবীর জন্ম নাকি বৃহস্পতিবারে, তাই এই দিনে তাঁর পূজা দেওয়া হয়। লক্ষীদেবীকে ঐশ্বর্য্য দেবী বলেও মনে করা হয়।

(৬) কে পূজাঃ- ইহা গঙ্গা ও মৃত্তিকা পূজা। সাধারণতঃ দেশে খরা দেখা দিলে এক বা একাধিক পাড়া বা গ্রামের একই সমাজভূক্ত লোকদের নিয়ে বড় রকমের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থ হতে চাঁদা উঠিয়ে শুকর, ছাগল, হাঁস, মোরগ, কবুতর এমনকি মহিষ খরিদ করে নদী বা ছড়ার তীরবর্তীস্থানে গিয়ে এই পূজা করা হয়ে থাকে। পূজারীদের মনে ধারণা এই যে, এই পূজা করলে বৃষ্টি হয়ে মাটি খুব উর্বর হবে এবং জুমের ফসলাদি অধিক বৃদ্ধি পাবে।

(৭) বুরপারাঃ- যদি কোন লোক হিংস্র পশুর দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, তৎক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির গোষ্ঠির মধ্যে যত লোক জীবিত আছে, উহাদের সকলের উপস্থিতিতে গোষ্ঠির সাত পুরুষ পর্যন্ত যত লোক আগে মারা গিয়াছে সাতপুরুষের নামের তালিকা পাওয়া না গেলে চার পুরুষ কিম্বা তিন পুরুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের নামের তালিকা প্রস্তুত করতঃ তাদের নাম উল্লেখ করে পিন্ডদান করা হয়। উক্ত পূজায় ছাগল, মোরগ, মুরগী ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত যে কোন পূজাদিতে 'মদ' অবশ্যই থাকতে হবে অন্যথায় পূজা হতে পারবে না। তবে ভূতের পূজায় মদের প্রয়োজন হয় না।

উপরোক্ত পূজাসমূহ ব্যতীত তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে আরও কতিপয় সামাজিক অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত আছে যেমনঃ ছেলেদের "ধুতী পৈ" মেয়েদের "কানফোরা পৈ" ও খাদি পৈ" ইত্যাদি।

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় "পৈ" শব্দের অর্থ হলো মেলা বা উৎসব। এই সমস্ত পৈ কিন্তু সকলের জন্য অবশ্য করণীয় নহে। এইগুলো এক প্রকার 'মানস' করার পরিপেক্ষিতে

করা হয়ে থাকে। যেমন- কোন স্বামী স্ত্রী মানস করে যে, যদি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় তাহলে উক্ত ‘ধুতীপৈ’ করাবেন। অতঃপর যদি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় তাহলে উক্ত ধুতীপৈ করে না দেওয়া পর্যন্ত ছেলে ধুতী পরিধান করতে পারবেনা।

মেয়েদের ‘কানফোরা’ ‘খাদি’ বা বক্ষ বন্ধনীপৈ ও উক্তরূপ মানসের কারণে করা হয়ে থাকে। উপরোক্তপৈ এর মাধ্যমে ছেলে বা মেয়েদেরকে বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট থেকে আশীবাদ নিতে দেওয়া হয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানঃ

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক অনুষ্ঠান এক নহে। সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বৈষয়িক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, লজ্জা ভয়, হাসিকান্না, আনন্দ বেদনার উৎসরূপে যে বস্তু বা ঘটনা মানুষের মনে নাড়া দেয় সেসব বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সামাজিক অনুষ্ঠান। ধর্মের সরাসরি প্রভাব সেখানে গৌণ। কেবল সমাজই মুখ্য। অপর পক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। ধর্মীয় বিশ্বাস গাঢ় হলে সেই বিশ্বাসের অনিবার্য্য প্রভাবে প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সংস্কার সাধিত হয় এমনকি কুসংস্কার বলে সমাজ থেকে বিদায় দেয়া হয়। যে ধর্ম মানুষকে ধারণ করে, সমাজকে ধারণ করে সুন্দর ও মহান করে তোলে, আদি, মধ্য ও অন্তে কল্যাণ এনে দেয় সেই বৌদ্ধ ধর্মই তঞ্চঙ্গ্যাদের ধর্ম। কাজেই বুদ্ধপূজা, সংঘদান, সূত্রশ্রবণ, অষ্ট পরিস্কার দান, প্রবারণা অনুষ্ঠান, কঠিন চীবর দান, মাঘী পূর্ণিমায় বুহচক্র মেলা, ফাগুনী পূর্ণিমায় জাতি সম্মেলন প্রভৃতি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। অধুনা লাভী শ্রেষ্ঠ অরহত সীবলী মহাস্থবিরের পূজাও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংগ হিসেবে সম্পন্ন করা হয়। তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রত্যেক গ্রামে মনোরম ক্যাং (বৌদ্ধ বিহার) প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

বাদ্য যন্ত্রঃ

তঞ্চঙ্গ্যাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁশি, বেলা, খেংখ্যং ও ঢুঢুক্ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(১) বাঁশিঃ ছয় ছিদ্রযুক্ত একটি বাঁশের ছোট নলির মাঝখানে মৌমাছির মোমদ্বারা আটকানো একটি যন্ত্র বিশেষ। তঞ্চঙ্গ্যা যুবকেরা নিজেরাই এই বাঁশি তৈরী করে নেয়। এর স্বর ও সুর অতি মধুর। তঞ্চঙ্গ্যা যুবকেরা উবাগীতের সুরে যখন এই বাঁশি বাজায় তখন শ্রোতাদের মন-প্রাণ মুগ্ধ হয়ে যায়।

(২) বেলাঃ বেহালাকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় 'বেলা' বলা হয়। তঞ্চঙ্গ্যা গেংগুলিরা ইহা বাজিয়ে সারারাত 'রাধামন–ধনপুতি' পালাগীত্ গেয়ে শ্রোতাদের মনে প্রচুর আনন্দ সঞ্চার করে থাকে। এই যন্ত্র মাদার গাছ দিয়ে তৈরী করা হয় এবং অবিকল বেহালার মতই গঠন প্রণালী।

(৩) খেংখ্যংঃ মিতিঙ্গাবাঁশের ছোট কঞ্চি দিয়ে ইহা তৈরী করা হয়। কঞ্চির মাঝখানে একটা সরু জিহ্বার মতো রাখা হয়। একপ্রান্তে ছোট দড়ি কিম্বা সূতা দিয়ে বাঁধা থাকে। তঞ্চঙ্গ্যা যুবতীরা এই যন্ত্র ঠোঁটের দু'ফাঁকে স্থাপন করতঃ দড়ি বা সূতাকে ঈষৎ টেনে টেনে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে সুর তোলে।

(৪) ঢুঢুক্ঃ ইহা এক জাতীয় ঢোল্। একটি মোটা শক্ত বাঁশের দু'দিকের দু পর্বা রেখে, মাঝখানে লম্বালম্বী একটা ছিদ্র রাখা হয়। ইহার বাদক বাম বগলের নীচে একাংশ রেখে অন্যহাত দিয়ে একটি শক্ত ভারী বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আঘাত করে তাল বাজায়।

সংগীতঃ

অধিকাংশ উপজাতীয় সংগীত্ বলতে নৃত্যগীত্কেই বুঝায়। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সে ধরণের নৃত্যগীত আছে। গেংগুলিরা যে গীত্ গেয়ে থাকে, তাহাকে কোন প্রকারেই সংগীত্ নামের আখ্যা দেওয়া চলে না। গেংগুলিরা কেবলমাত্র একটা বেহালাকে সম্বল করে এককভাবে রাতভোর অবধি উবাগীতের সুরে গেয়ে থাকে; সে গীত্ "রাধামন্ ধনপুদি" পালা বিষয়ক। ওই গীতের মধ্যে তেমন কলা-কৌশলের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বর্ণনামূলক রাধামন-ধনপুদির পালাগীতের গেংগুলিরা একাই সারারাত্র গেয়ে থাকে। অধুনা তঞ্চঙ্গ্যা গীতের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। নৃত্যের মধ্যে মন্দির নৃত্য, জুম নৃত্য এবং আধুনিক নৃত্য উল্লেখযোগ্য।

চাকমা জাতির ইতিহাস প্রণেতাগণ দৈংনাক বা তঞ্চঙ্গ্যাগণকে চাকমা জাতির একটি শাখা অর্থাৎ চাকমা জাতি থেকেই তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত সঠিক বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, দৈংনাক বা তঞ্চঙ্গ্যাগণ সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করেও চাকমা বা অপর কোন জনগোষ্ঠীর বা জাতির সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। তাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তাদেরকে বরাবরই পৃথক করে রেখেছে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্ত্বা নিয়ে ইতিহাসের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে, আজ আরাকান তথা মায়ানমার, ভারতের মিজোরাম, অরুণাচল, মনিপুর আসামের সীমান্ত অঞ্চল, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে এবং বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা সমূহে (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) ও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলায় তারা ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বসবাস করছে। এসব অঞ্চলের তঞ্চঙ্গ্যাদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অপরাপর জনগোষ্ঠীর কোন দ্বন্দ্ব ছিল বা আছে বলে এযাবৎ কোন নজির পাওয়া যায়নি।

ভারতে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাগণ বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে বসবাস করলেও তাদের মধ্যে একাত্মভাব পরিলক্ষিত হয়। সংখ্যা লঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বলে ওখানে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাথে জীবিকা অর্জন, শিক্ষা দীক্ষা, ব্যবসায় ও চাকুরী ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতার মুখোমুখী হচ্ছে। তথাপি তারা টিকে আছে। কেননা, টিকে থাকার শক্তি তারা অর্জন করেছে বলেই টিকে আছে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের বৃহদাংশ আরাকান তথা মায়ানমারে বসবাস করছে সেখানে তারা দৈংনাক নামেই সমধিক পরিচিত। সেখানে তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরাপর অঞ্চলের তঞ্চঙ্গ্যাদের চাইতে অধিকতর অগ্রগতিও সাফল্য লাভ করেছে বলে জানা যায়। ধনী বা ধনসম্পদশালী বহু তঞ্চঙ্গ্যা পরিবার সেখানে যেমন আছে তেমনি বহু তঞ্চঙ্গ্যা (সেখানে দৈংনাক) সরকারী উচ্চ (Executive) পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং আরাকান বা মায়ানমার সেনাবাহিনীতে বহুব্যক্তি অফিসার পদমর্য্যাদায় যেমন কেপ্টেইন, মেজর, কর্ণেল পদে রয়েছেন বলে জানা যায়। এর অধিক উচ্চ পদে থাকাও অসম্ভব নহে। দৈংনাকদের উৎপত্তিস্থল বা জন্মভূমি বলে কথিত আরাকান বা

মায়ানমারে তারা পরিপূর্ণ জীবন বিকাশের সুযোগ লাভ করবে তা স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ তথাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এবং সরকারের উদারতার ফলে তা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে তঞ্চঙ্গ্যাগণ সংখ্যায় অর্ধলক্ষের অধিক। (বেসরকারী হিসেবে) বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা এগারকোটী। এসংখ্যার তুলনায় তঞ্চঙ্গ্যাদের সংখ্যা অতি নগন্য। নগন্য সংখ্যক হলেও দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংগে তঞ্চঙ্গ্যাগণ একাত্ম অনুভব করে। বাংরাদেশ সংসদে আইন পাশ করে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তঞ্চঙ্গ্যাদের তিনটি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। এভাবে এই ক্ষুদ্রতর জাতিসত্ত্বাকে দেশের অপরাপর জনগোষ্ঠীর সমতুল্য রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য জেলা সমূহে উপজাতীয় জনগণের জন্য যে আলাদা সুযোগ সুবিধা আছে সে সুযোগ সুবিধা না থাকলেও চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার তঞ্চঙ্গ্যাগণ তুলনামূলকভাবে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার তঞ্চঙ্গ্যাগণের চাইতে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তাদের চিন্তাধারা ও কর্ম বাস্তব এবং জীবন মুখী বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলার অধিকাংশ তঞ্চঙ্গ্যাই ষাটের দশকে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জমিজমা ও বসতিস্থান জলমগ্ন হলে রাজস্থলী, রাইখালী এবং বান্দরবান জেলার বিভিন্ন স্থান যথাঃ বালাঘাটা, রেইছা, রোয়াংছড়ি, নোয়াপতং, বাঘমারা, রুমা, সোয়ালক, রাজবিলা, আলীকদম প্রভৃতি জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। পূর্বতন জায়গায় (কাপ্তাই হ্রদ এলাকা) বহু পরিশ্রম করে আবাদ করা জমি জমা নিয়ে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করেছিল, সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। নুতন বসতিস্থানে গিয়ে তারা অর্ধাহারে, অনাহারে থেকে কঠোর পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের ফলে জমি জমা আবাদ করে পূনরায় নূতন স্বপ্ন ভরা জীবন আরম্ভ করে।

হোয়াম্রা, বারঘোনিয়া, ভালুক্যা, নারানগ্রী প্রভৃতি এলাকায় তঞ্চঙ্গ্যাগণকে স্থানান্তরিত হতে হয়নি তাই তাদের মূল বসতি স্থানে তাদের আরব্ধ আর্থ সামাজিক ও শিক্ষা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকতে পেরেছে। রাইংখ্যং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাগণ দীর্ঘদিন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। অধুনা কয়েকজন তরুণ

তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেছে এবং উচ্চতর শ্রেণীতে পড়াশোনায়রত আছে।

ভারত ও আরাকান তথা মায়ানমারের তঞ্চঙ্গ্যাগণ শিক্ষা ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হয়েছে তার সঠিক খবর আমাদের জানা নেই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে সংখ্যায় কম হলেও পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর লোকজনের ন্যায় তারাও শিক্ষা দীক্ষায় নিজেদের সুদক্ষ পদচারণা অব্যাহত রেখেছে; এবং তা বললে ভূল হবে না।

বাংলাদেশের তঞ্চঙ্গ্যাগণ এযাবৎ শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি লাভ করেছে। জীবনের প্রতিটিক্ষেত্রে তাদের সুদক্ষ পদচারণার প্রমাণ রয়েছে তা এই গ্রন্থেই তালিকা সংযোজিত করা হয়েছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, - তঞ্চঙ্গ্যাগণ সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আইন, প্রশাসন, ইতিহাস, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, আর্থসামাজিক প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভে সাফল্য অর্জন করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সুদক্ষ পদচারণা তারা অব্যাহত রেখেছে। তারা পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, কষ্টসহিষ্ণু, আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল, ধৈর্যশীল, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বন্ধুবৎসল এবং কর্মে একনিষ্ঠ বলেই এই ত্বরিৎ অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের এই অগ্রগতি ও সাফল্য অনাগত ইতিহাসের জন্য সমৃদ্ধির স্বর্ণ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে।

তাদের কষ্টার্জিত বা আয়াশলব্ধ ঐতিহ্য, ধনঐশ্বর্য্য নিজেদের ভোগ বিলাস চরিতার্থ করার জন্য শুধু নহে, সেই ঐতিহ্য, ধন ঐশ্বর্য্য মানবজাতির কল্যাণের লক্ষ্যে সবার জন্য উন্মুক্ত বলে তারা মনে করে। এই কল্যানকর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তঞ্চঙ্গ্যাগণ বিশ্বের দরবারে আপন মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে সামনে অগ্রসর হবে। তাদের আশা আনন্দ, সুখ সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও সাফল্য বিশ্বের সকলের জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক এই কামনা।

সমাপ্ত

সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ

১। চাকমা জাতি ঃ — শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ।

২। চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত ঃ — শ্রী বিরাজ মোহন দেওয়ান।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন দীন সেবকের কাহিনীঃ — শ্রী কামিনী মোহন দেওয়ান প্রথম সংস্করণঃ ১৯৭০ ইং।

৪। চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার ঃ — শ্রী অশোক কুমার দেওয়ান ১ম সংস্করণঃ ১৯৯১ ইং।

৫। অগ্রবংশ মহাস্থবির বরনোৎসব কার্য্যবিবরণী ঃ — শ্রী চিত্রগুপ্ত চাকমা ১৩৭১ বাংলা; ১৯৬৬ ইং।

৬। বৃহতের সন্ধানেঃ শ্রীলংকা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বোধিবৃক্ষচারা রোপন ও শ্রীমৎ সাধনানন্দ স্থবির (বনভন্তে) এর মহাস্থবির বরনোৎসব কার্য্যবিবরণী ঃ — শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ইং ।

৭। চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপ ঃ — সুপ্রিয় তালুকদার প্রথম সংস্করণঃ ১৯৮৭ ইং।

৮। W. F. B REVIEW, ISSN 0125-023x VOL. xx NO. 4 FOURTH QUARTER-1983 : Mr. Buddhasukh, Bangkok, Thailand.

৯। তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি ঃ — যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা প্রথম সংস্করণঃ ১৯৮৫ ইং।

১০। প্রাচীন আরাকান রোয়াঙ্গ্যা হিন্দু বড়ুয়া বৌদ্ধ জাতি ঃ — আবদুল হক চৌধুরী, বাংলা একাডেমী প্রথম প্রকাশঃ ১৪০০ সাল; ১৯৯৪ ইং।

১১। রাজবনবিহার কঠিন চীবর দানোৎসব স্মরণিকা '৯৩, রাঙ্গামাটি।